আরোহ অনুমান
Inductive Inference

ইউনিট ১০

ভূমিকা

যুক্তিবিদ্যার কাজ হলো বৈধ যুক্তি থেকে অবৈধ যুক্তি, প্রাসঙ্গিক যুক্তি থেকে অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি, যথার্থ যুক্তি থেকে অযথার্থ যুক্তি পার্থক্য করণের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের সত্যতা বা যথার্থতা নির্ণয় করা। সত্যতা বলতে দুই ধরনের সত্যতা বুঝায়: আকরগত ও বস্তুগত। যথার্থ সত্য জ্ঞান বলতে এই দুই ধরনের সত্যতার সমন্বয়কে বুঝায়। প্রকৃত সত্য পাওয়ার জন্য অনুমানকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এজন্য এমন পদ্ধতি বের করা প্রয়োজন যার সাহায্যে সত্য মিথ্যার অনিশ্চয়তা দূর হয়। যুক্তিবিদদের মতে, এ নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি মূলত দুইটি; অবরোহ পদ্ধতি ও আরোহ পদ্ধতি। অবরোহ অনুমানের এক বা একাধিক আশ্রয়বাক্য হতে অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্ত নি:সৃত হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত লক্ষ্য রাখা হয় যুক্তি বা অনুমানের আকারগত সত্যতার দিকে। সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতা এক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্ণয় করা যায় না। অর্থাৎ অবরোহ যুক্তিবিদ্যা দ্বারা যুক্তির বা জ্ঞানের আংশিক সত্যতাই নির্ণয় করা যায়। আবার, অবরোহ যুক্তি প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নি:সৃত হয় বলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব বা নতুনত্ব দাবী করা যায় না। তাই যুক্তি বা অনুমানের ক্ষেত্রে বস্তুগত সত্যতা আবিষ্কার ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুনত্ব প্রাপ্তির উপায় খুজঁতে গিয়েই উদ্ভব ঘটে আরোহ অনুমান তথা-আরোহ যুক্তিবিদ্যার। মূলত: অবরোহ অনুমানের অসম্পূর্ণতাই আরোহ অনুমান উদ্ভবের কারণ। আরোহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন শ্রেণির অসংখ্য দৃষ্টান্তের অন্তর্গত কিছু দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে সমগ্র শ্রেণি অথবা কোনো বিষয়ের কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনার পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে সামান্যীকরণ বা সার্বিকীকরণ প্রক্রিয়ায় একটি সংশ্লেষক বাক্য প্রতিষ্ঠাই হলো আরোহ অনুমানের মূল কাজ। আর এ সামান্যীকরণের ভিত্তি হলো প্রকৃতির একরূপতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়ম। আর, আরোহের দৃষ্টান্তগুলো সংগ্রহ করা হয় পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের ভিত্তিতে। অর্থাৎ আরোহের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য আকারগত ও বস্তুগত উভয় ধরনের ভিত্তিই প্রয়োজন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময়০৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১০.১ : মিশ্র সহানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ (Definition and Example of Mixed Syllogism)
পাঠ- ১০.২ : আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর ও আরোহের শ্রেণি বিভাগ (Different Stages of Induction and Classification of Induction)
পাঠ - ১০.৩ : আরোহের প্রয়োজনীয়তা ও আরোহের ভিত্তি (Importance of Induction and Grounds of Indtction)
পাঠ - ১০.৪ : আকারগত ভিত্তি : প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এবং আরোহের কূটাভাস(Formal Ground of Induction: Law of Uniformity of Nature and Paradox of Induction)
পাঠ - ১০.৫ : আকারগত ভিত্তি : কার্যকারণ নীতি (Formal Ground of Induction: The Law of Cousation)
পাঠ - ১০.৬ : বহুকারণবাদ, বহুকারণ সমন্বয় ও কার্য সংমিশ্রণ (Plurality of Causes, Conjunction of Causes and Intermixture of Effects)
পাঠ - ১০.৭ : আরোহের বস্তুগত ভিত্তি: নিরীক্ষণ (Material Ground of Induction: Observation)
পাঠ - ১০.৮ : আরোহের বস্তুগত ভিত্তি : পরীক্ষণ (Material Ground of Induction: Experiment)
পাঠ - ১০.৯ : নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Observation and Experiment)

পাঠ-১০.১ মিশ্র সহানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ (Definition and Example of Mixed

Syllogism)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আরোহ অনুমানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- আরোহের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

আরোহের সংজ্ঞা (Definition of Induction) ঃ আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে কতিপয় দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য অনুমান করা হয়। এক্ষেত্রে আমরা কতিপয় থেকে সমগ্র বিষয়ে, নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিত ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিক বাক্যে গমন করি। এখানে অল্প সংখ্যক দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে একটি উল্লম্ফন দিয়ে সমজাতীয় বিষয়ের শ্রেণিটি সম্পর্কে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। যুক্তিবিদ্যার জনক এরিস্টটল (Aristotle) তাঁর *Topics* গ্রন্থে আরোহের সংজ্ঞায় বলেন, আরোহ হলো বিশেষ থেকে সার্বিকে যাওয়ার প্রক্রিয়া।(Induction is a passage from individuals to universal).

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে বলেন যে,আরোহ হচ্ছে মনের সে প্রক্রিয়া যার ভিত্তিতে আমরা অনুমান করি যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যা সত্য তা সকল ক্ষেত্রেই সত্য। তিনি আরো বলেন, আরোহ হলো সার্বিক যুক্তিবাক্য আবিষ্কার ও প্রমাণ করার পদ্ধতি (Induction is the process of discovering and proving general real proposition)।

থমাস ফাউলার (Thomas Fowler) তাঁর *The Elements of Inductive Logic* গ্রন্থে বলেন যে, আরোহ হলো বিশেষ থেকে সার্বিক অথবা কম ব্যাপক থেকে বেশি ব্যাপক বাক্যের ন্যায়সঙ্গত অনুমান।"

আলেকজান্ডার বেইন (Alexander Bain) তাঁর *Logic* গ্রন্থে বলেন, ঘটনাবলি নিরীক্ষণের মাধ্যমে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্যে উপনীত হওয়াকেই আরোহ বলে (Induction is the process of arriving at a general real proposition by means of observation of facts.)।

যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (CarvethRead) আরোহের সংজ্ঞায় বলেন,আরোহ হলো এমন একটি যুক্তি প্রক্রিয়া যেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের ভিত্তিতে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক সংশ্লেষক বাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয় (By induction we mean the inferential passage to the universal proposition based on observation in reliance on the uniformity of nature.)।

ফ্রান্সিস হাওয়ার্ড-স্নাইডার (Frances Howard-Snyder), ড্যানিয়েল হাওয়ার্ড-স্নাইডার (Daniel Howard-Snyder)ও রায়ান ওয়াসেরম্যান (Ryan Wasserman) তাঁদের *The Power of Logic* গ্রন্থে সিদ্ধান্তের প্রকৃতি অনুসারে আরোহের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, আরোহ হলো এমন একটি অনুমান যার আশ্রয়বাক্য কোনো প্রকার নিশ্চয়তা ছাড়াই একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে।(An inductive argument is one in which the premises are intended to make the conclusion probable without guaranteeing it.)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আরোহ অনুমানের সংজ্ঞা আমরা নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরতে পারি, যে অনুমান প্রক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের আলোকে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতানীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর ভিত্তি করে আরোহাত্মক উল্লম্ফনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে আরোহ অনুমান বলে। যেমন-

রহিম হয় মরণশীল
করিম হয় মরণশীল
খালেক হয় মরণশীল
মালেক হয় মরণশীল

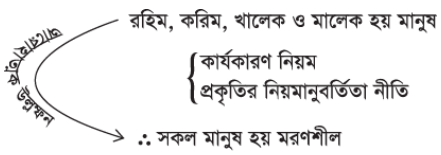

প্রদত্ত উদাহরণটিতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্তের আলোকে কার্যকারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি অনুসরণ করে আরোহাত্মক উল্লম্ফনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি সার্বিক সংশ্লেষক বাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Induction) ঃ আরোহ অনুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে এর যেসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় সেগুলো হলো:

১। আরোহ অনুমানে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয় ঃ আরোহ অনুমানে যে সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয় তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে কতিপয় বস্তু বা ঘটনার পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের উপর। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সাধারণ সত্যে পৌঁছা হলো আরোহানুমানের লক্ষ্য। যে সকল আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নি:সৃত হয়, সেগুলোর বস্তুগত সত্যতা আছে কি না তা নির্ণয় করা আরোহ অনুমানের কাজ। এজন্য কতগুলো বস্তু বা ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করা অবশ্য প্রয়োজন। আরোহ অনুমানে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে শুধু কল্পনা বা মনগড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এই সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার ভিত্তি স্বরূপ কতিপয় ব্যক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজন। তাই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ হলো আরোহ অনুমানের বস্তুগত ভিত্তি।

২. আরোহ অনুমান প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভরশীল ঃ আরোহ অনুমানে সমস্যার সমাধান করতে হলে অর্থাৎ জানা থেকে অজানায়, কতিপয় থেকে সকল বা বিশেষ থেকে সার্বিক সত্যে পৌঁছাতে হলে যেমন কতগুলো বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করা প্রয়োজন তেমনি প্রকৃতির একরূপতা নিয়ম ও কার্যকারণ নীতিতে বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিতে বিশ্বাস না থাকলে কোনো সাধারণ ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। অতীতে যা ঘটেছে একই অবস্থা বিরাজ করলে আবার তা ঘটবে। অর্থাৎ যে অবস্থায় কতিপয় ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, একই অবস্থা সকলের ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকলে সকলের মৃত্যু ঘটবে।

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ছাড়াও আরোহ অনুমানকে আরো একটি মূলসূত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। এই মূল সূত্রটিকে কার্যকারণ নিয়ম বলা হয়। এ নিয়মের মূলকথা হলো, প্রত্যেক কার্য বা ঘটনার একটি কারণ থাকবেই। এই দু'টি বিধিকে একত্রিত করে আমরা বলতে পারি যে, একই কারণ সকল সময়ে একই কার্য উৎপন্ন করবে। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি বিশেষ থেকে সার্বিক এ ব্যবধান অতিক্রমের সাধারণ আকার দেয়। কিন্তু আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তকে কার্যকারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তা নির্ভুল, ত্রুটিমুক্তি ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়।

৩. আরোহ অনুমান বস্তুগত সত্যতার নিশ্চয়তা দেয় ঃ আরোহ অনুমানের আশ্রয়বাক্যগুলো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। এর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় এর আশ্রয় বাক্যগুলোর ভিত্তিতে। আরোহ অনুমানের আশ্রয়বাক্যগুলো পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয় বলে এগুলো বস্তুগতভাবে সত্য হয়। আবার, আরোহের সিদ্ধান্তটি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়ম অনুসারে নেয়া হয় বলে তা আকারগতভাবে সত্য হয়। অর্থাৎ আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তের বস্তুগত ও আকারগত উভয় ধরনের সত্যতাই থাকে।

৪. আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত সব সময়ই আশ্রয়বাক্যের তুলনায় বেশি ব্যাপক হয় ঃ আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত সাধারণত সার্বিক যুক্তিবাক্য হয়ে থাকে। আরোহ অনুমানের মূল লক্ষ্য হলো কোনো শ্রেণির যাবতীয় বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে নতুন সত্যের ঘোষনা করা। সেক্ষেত্রে এ অনুমান প্রক্রিয়ায় এক জাতীয় কয়েকটি বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে সমজাতীয় সকল বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়। পর্যবেক্ষিত বস্তু বা ঘটনার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তে পুরো শ্রেণিকেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সুতরাং আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয় বাক্যের তুলনায় বেশি ব্যাপক হয়।

৫. আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হলো একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য ঃ আরোহ অনুমানে যে বাক্যটিকে সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তা একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য। আরোহ অনুমানের মূল কাজ হলো কোনো শ্রেণির সকল বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে নতুন তথ্য ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য আরোহের সিদ্ধান্তটিকে সার্বিক যুক্তিবাক্য হতে হয়। কারণ সার্বিক বাক্যের ক্ষেত্রেই কেবল কোনো বিষয় বা শ্রেণির সমগ্র ব্যক্তর্থ সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকরা করা যায়।

৬. আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হিসেবে সংশ্লেষক বাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয় ঃ আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হিসেবে যে সার্বিক বাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয় তা সংশ্লেষক বাক্য। বিশ্লেষক বাক্যের মাধ্যমে আমরা কোনো নতুন তথ্য জানতে পারিনা, শুধু তার সারধর্মের জ্ঞান পাই। বিশ্লেষক বাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের কেবল জাত্যর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তব জগত সম্পর্কে নতুন তথ্য ঘোষণা করাই আরোহ অনুমানের লক্ষ্য। তাই বিশ্লেষক বাক্য আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হতে পারেনা। একমাত্র সংশ্লেষক বাক্যই আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হতে পারে।

৭. প্রত্যেক আরোহ অনুমানে একটি আরোহমূলক উল্লম্ফন থাকে ঃ প্রত্যেক আরোহ অনুমানে কতিপয় থেকে সকল, বিশেষ থেকে সার্বিক, অব্যাপক থেকে ব্যাপক এই ব্যবধান অতিক্রম করা হয়। আরোহনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য অপেক্ষা অধিক ব্যাপক হয়ে থাকে। অর্থাৎ আরোহ অনুমানে আশ্রয় বাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছু না কিছু ফাঁক বা ব্যবধান থাকবেই। এই ব্যবধান অতিক্রম করাই হলো আরোহের প্রধান কাজ। এই ব্যবধান অতিক্রম করার প্রক্রিয়াকে যুক্তিবিদ্যার ভাষায় বলা হয় Inductive Leap বা hazard (from the known to the unknown)। অর্থাৎ আরোহমূলক উল্লম্ফন বা ঝুঁকি। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) ও আলেকজান্ডার বেইন (Alexander Bain) এর মতে, এরূপ লাফ বা ঝুঁকিই হলো আরোহ অনুমানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	আরোহ অনুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে এর যেসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় সেগুলো লিপিবদ্ধ করুন

সারসংক্ষেপ

কতিপয় বিশেষ দৃষ্টান্তের আলোকে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়ম ব্যবহার করে আরোহাত্মক উল্লম্ফনের মাধ্যমে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিপাদন করার প্রক্রিয়া হলো আরোহ। এর সিদ্ধান্ত সকল ক্ষেত্রেই আশ্রয়বাক্যের তুলনায় ব্যাপক হয়। এ ধরনের অনুমানের সিদ্ধান্ত বস্তুগত সত্যতার নিশ্চয়তা দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। 'আরোহ অনুমান হলো বিশেষ থেকে সার্বিকে যাওয়ার প্রক্রিয়া' কে বলেছে?

(ক) এরিস্টটল (খ) মিল (গ) বেইন (ঘ) বেকন

২। আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে-

(i) জ্ঞানের অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়

(ii) বস্তুগত সত্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়

(iii) সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

৩। 'A System of Logic' বইটি কার লেখা?

(ক) এরিস্টটল (খ) মিল (গ) বেইন (ঘ) আই. এম. কপি

পাঠ-১০.২ আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর ও আরোহের শ্রেণি বিভাগ (Different Stages of Induction and Classification of Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আরোহের বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আরোহ অনুমানের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তর (Different Steps or Stages of Induction) ঃ গোটা বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে কেবল মানুষেরই রয়েছে বুদ্ধি ও মননশীলতা গুণটি। মানুষ তার পার্থিব জীবনে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় এবং তাকে বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় । সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অন্যতম একটি মাধ্যম হলো অনুমান। অনুমানের একটি পদ্ধতি হলো আরোহ। আরোহ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সার্বিক বা সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা। এ সার্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠার জন্য ঘটনাবলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা প্রয়োজন। কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের মানে হলো কোনো কারণের কার্যনির্ধারণ করা বা কোনো কার্যের কারণ আবিষ্কার করা । কিন্তু প্রকৃতিতে ঘটনাবলি খুবই জটিল অবস্থায় থাকে। তাই কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য ধাপে ধাপে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এ ধাপগুলোকেই বলা হয় আরোহের পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যুক্তিবিদগণ যেসব স্তরের কথা বলেন সেগুলো যথাযথভাবে অতিক্রম করেই সার্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা যায়। নিম্নে আরোহের স্তরগুলো উল্লেখ করা হলো:

ক. সংজ্ঞায়ন
খ. পর্যবেক্ষন
গ. বিশ্লেষণ
ঘ. শ্রেণিকরণ
ঙ. অপনয়ন
চ. প্রকল্প প্রণয়ন
ছ.সার্বিকীকরণ
জ. যাচাইকরণ
ঝ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নিম্নে এ স্তরগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো।

সংজ্ঞায়ন : আরোহের শুরুতেই আমাদের নির্বাচিত বিষয় সংজ্ঞায়িত করে নেয়া প্রয়োজন। এর মানে হলো আমরা যে বিষয়টির কারণ বা কার্য নির্ণয় করতে চাই সে বিষয়টি যেন অন্যান্য বিষয়ের সাথে গুলিয়ে না যায় সেজন্য বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট করে নিতে হয়। বিষয়টি সুনির্দিষ্টকরণের জন্য প্রয়োজন সংজ্ঞায়ন। যেমন, আমরা ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ নির্ণয় করতে চাই। ম্যালেরিয়া জ্বর অন্যান্য জ্বর থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। তাই ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সংজ্ঞায়নের মাধ্যমেই আমরা তা করতে পারি।

পর্যবেক্ষণ : আরোহ অনুমানের দ্বিতীয় স্তর হলো পর্যবেক্ষণ। সুনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষণই হলো পর্যবেক্ষণ। এ পর্যায়ে আমরা যে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই সে বিষয়টি উপস্থিত এমন কিছু দৃষ্টান্তে প্রাথমিক প্রত্যক্ষণ করতে হবে এবং এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করতে হবে। যেমন- আমরা ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কার করতে চাই। তাই ম্যালেরিয়া রোগের সাথে সংশ্লিষ্ট পূর্বাপর ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

বিশ্লেষণ : আরোহ অনুমানে সার্বিক সংশ্লেষক বাক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্লেষণ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কোনো বিষয়কে তার মৌলিক অংশসমূহে ভাগ করে দেখানো বা কোনো ঘটনার উৎপত্তি, মৌলিক আনুষঙ্গিক কারণ, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য পরিণতি উদ্‌ঘাটন করে দেখানোকে বিশ্লেষণ বলে। অধিকাংশ পার্থিব ঘটনাই জটিল । এসব জটিল ঘটনার সাথে আরো অতিরিক্ত অনেক অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় জড়িত থাকে । এদেরকে পৃথক করলে কোনো ঘটনার সাথে তার সংলগ্ন ঘটনার সংযোগসূত্র বের করা যায়। তাছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়কে রেখে অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে বাদ দিতে হয়। সুতরাং আমাদের অনুসন্ধানের স্বার্থে অনুসন্ধানের বিষয়টিকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করে দেখতে হবে।

যেমন, অনেক ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ অন্যান্য রোগ ও উপসর্গের সাথে মিশে থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জটিল অবস্থাসমূহ বিশ্লেষণ করে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থাসমূহকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে নিতে হবে।

শ্রেণিকরণ : অনুসন্ধেয় ঘটনার সাথে কোন্ কোন্ বিষয় সম্পৃক্ত হতে পারে, আবার কোন্ কোন্ বিষয় সংশ্লিষ্ট নয়, তা বিবেচনা করে এদের বিন্যস্ত করার প্রক্রিয়াই হলো শ্রেনিকরণ। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে বাছাই করে নিতে

হয়। আমরা আগেই বলেছি, জ্বর বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সেক্ষেত্রে যাদের জ্বরে ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণসমূহ উপস্থিত তাদেরকে পৃথক করে একটা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে নিতে হয়।

অপনয়ন : আলোচ্য ঘটনা ঘটার সাথে আপাতদৃষ্টিতে জড়িত সকল বিষয়ই আবশ্যিক বা অপরিহার্য নয়। এর মধ্যে কয়েকটি হলো পূর্ববর্তী অপরিবর্তনীয় ঘটনা এবং কিছু হলো আকস্মিক ও অবান্তর ঘটনা। আর্থাৎ আলোচ্য ঘটনার সাথে কিছু বিষয় সকল সময় উপস্থিত থাকে, আর কিছু কিছু বিষয় কখনো কখনো উপস্থিত থাকে। সুতরাং কারণ নির্ণয়ের জন্য আমাদেরকে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অপনয়ন করে নিতে হয়। যুক্তিবিদ ফ্রান্সিস বেকনের (Francis Bacon) মতে, এ অপনয়ন প্রক্রিয়া সার্থক করার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাবলি পরিবর্তন সাধন নীতির (Varying the circumstance) আশ্রয় নেওয়া দরকার। তিনি মনে করেন যে, আলোচ্য ঘটনাকে পরিবর্তিত পরিবেশের মধ্যে পরীক্ষা করা হলে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে সহজেই অপনয়ন বা বাতিল করা যায়।

প্রকল্প প্রণয়ন : আলোচ্য ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো একটি ঘটনাকে আলোচ্য ঘটনাটির কারণ বলে সাময়িকভাবে আন্দাজ করাই হলো প্রকল্প প্রণয়ন। প্রকৃত কারণ আবিষ্কারের পূর্বে একটি কারণকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করা না হলে অনুসন্ধান কার্যই শুরু করা যায় না। প্রকল্প যেমন একটি উপাদানকে সাময়িকভাবে আলোচ্য ঘটনার কারণ বলে ধরে নেয় তেমনি অন্যান্য উপাদানগুলোকে সাময়িকভাবে বাতিল করে। উইলিয়াম হিওয়েল (William Whewell) প্রকল্প প্রণয়নকে আরোহ পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে মনে করেন। ম্যালেরিয়া রোগের সাথে আমরা যেসব বিষয়কে সব সময় উপস্থিত থাকতে দেখেছি সম্ভবত তাদের মধ্যে যে কোনো একটি ম্যালেরিয়া রোগের কারণ হবে। তাই এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি কে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ বলে ধরে নিয়ে অনুসন্ধান কার্য শুরু করতে হয়।

সার্বিকীকরণ : যদি দেখা যায় কল্পিত কারণটি নিরীক্ষিত দৃষ্টান্ত ছাড়াও আরো কয়েকটি ক্ষেত্রে একইভাবে উপস্থিত, তখন কারণটি সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এভাবে বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে বিষয়ের প্রযোজ্যতা পরীক্ষা করে সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করাকে সার্বিকীকরণ বা সামন্যীকরণ বলা হয়। যুক্তিবিদজন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর মতে সার্বিকীকরণ হলো আরোহের প্রধান ও চুড়ান্ত স্তর। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখি যে, ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তি হয় মশার কামড় থেকে। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, সকল ক্ষেত্রে মশার কামড়ই ম্যালেরিয়া রোগের কারণ।

যাচাইকরণ : আরোহ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ স্তর হলো যাচাইকরণ। এ স্তরে গৃহীত সার্বিক সিদ্ধান্তটি যথার্থ কি-না তা যাচাই করে নিতে হয়। আমরা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সিদ্ধান্তকে যাচাই করতে পারি। প্রত্যক্ষ যাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় বাস্তব ঘটনাবলির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত যাচাই করা হয়। কিন্তু পরোক্ষ যাচাই করণ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তকে বিশেষ বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তা কার্যকর কি না তা লক্ষ্য করা হয় অথবা গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে আরেকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে বাস্তবের সাথে মিলিয়ে দেখতে হয়।

সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা ঃ আরোহ অনুমানের মূল উদ্দেশ্য হলো সিদ্ধান্ত হিসেবে সার্বিক সত্য প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে উপর্যুক্ত স্তরগুলো অনুসরণ করার মাধ্যমে একটি প্রমাণিত সার্বিক সংশ্লেষক বাক্যকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং এটি বৈজ্ঞানিক সত্য বা প্রকৃতির নিয়ম বলে বিবেচিত হয়।

আরোহের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Induction) ঃ যে অনুমান প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকরণ নিয়মের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের আলোকে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাই হলো আরোহ। এদিক বিবেচনায় আরোহ অনুমানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা-

১. প্রকত বা যথার্থ আরোহ (Induction Proper)
২. অপ্রকৃত বা অযথার্থ বা তথাকথিত আরোহ (Induction Improper)

প্রকৃত বা যথার্থ আরোহ ঃ যে আরোহ অনুমানে আরোহের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেষভাবে জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে গমন ও আরোহাত্মক উল্লম্ফন উপস্থিত থাকে তাকে প্রকৃত বা যথার্থ আরোহ বলে। যেমন, কয়েকবারের পরীক্ষায় দেখা গেল যে তাপ প্রয়োগে পদার্থ প্রসারিত হয়। এর ব্যতিক্রম কখনো দেখা যায়নি। এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, সকল ক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগে পদার্থ প্রসারিত হয়।

প্রকৃত বা যথার্থ আরোহ তিন প্রকার; যথা-

১. বৈজ্ঞানিক আরোহ (Scientific Induction)
২. অবৈজ্ঞানিক আরোহ (Unscientific Induction)
৩. সাদৃশ্যানুমান (Argument from Analogy)

১. বৈজ্ঞানিক আরোহ ঃ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকরণ নিয়মের উপর ভিত্তি করে যে আরোহ অনমুানে পরিবেশ পরিবর্তনের দ্বারা কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে একটি সার্বিক সংশ্লেষক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। এখানে পরিবেশ পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। যাতে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অপনয়ন করে সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায়।জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) মনে করেন যে, আরোহের এ পদ্ধতিতেই আমরা কোন ঘটনার কার্য বা কারণ আবিষ্কার ও প্রমাণ করি। যেমন- কয়েকটি দৃষ্টান্তেদেখা গেল যে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে থার্মোমিটারের পারদ স্তম্ভ উপরে ওঠে। এর ব্যতিক্রম কখনো দেখা যায়নি। এখন প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, সকল ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে থার্মোমিটারের পারদ স্তম্ভ

উপরের দিকে ওঠে।

২. অবৈজ্ঞানিক আরোহ : অবৈজ্ঞানিক আরোহের প্রকৃতি প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) বলেন যে, কোনো বিষয় সম্পর্কে যা সত্য বলে জানা গেছে তা যদি সমজাতীয় সকল বিষয় সম্পর্কে সত্য হয়, তাহলে সে সত্যের ভিত্তিতে একটি সার্বিক সত্যবাক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াই হলো অবৈজ্ঞানিক আরোহ।

যুক্তিবিদআলেকজান্ডার বেইন (Alexander Bain)বলেন, একটি বিষয়ের ব্যতিক্রম কখনো দেখা যায়নি বলে অবৈজ্ঞানিক আরোহের ক্ষেত্রে কেবল অনুকূল দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি সাধারণ সংশ্লেষক বাক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ছাড়াই প্রকৃতিতে সাধারণভাবে উপস্থিত ঘটনা বা কেবল অনুকূল দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার আলোকে যে আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। যেমন-এ যাবৎ আমরা যত বক দেখেছি তার সবই সাদা এবং এর ব্যতিক্রম এখনো চোখে পড়েনি। এ থেকে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, 'সকল বক হয় সাদা' তাহলে তা হবে অবৈজ্ঞানিক আরোহ। অবৈজ্ঞানিক আরোহের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিকূল দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩. সাদৃশ্যানুমান ঃ যে আরোহ অনুমানে দুই বা ততোধিক বস্তু বা শ্রেণির মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখে অন্য বিষয়েও সাদৃশ্য আছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে সাদৃশ্যানুমান বলে। যেমন- পৃথিবী ও মঙ্গল দু'টি গ্রহ। উভয় গ্রহ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। উভয়ের মাঝে বায়ু, ভূমি, তাপ ও পানি রয়েছে। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। অতএব, মঙ্গল গ্রহেও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে।

সাদৃশ্যানুমান কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

১. সাধু সাদৃশ্যানুমান (Good Analogy)
২. অসাধু সাদৃশ্যানুমান (Bad Analogy)

১. সাধু সাদৃশ্যানুমান : যে সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক, অন্তর্নিহিত ও অধিক সংখ্যক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে সাধু সাদৃশ্যানুমান বলে।

২. অসাধু সাদৃশ্যানুমান : যে সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে অমৌলিক, গুরুত্বহীন ও অপ্রাসঙ্গিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় তাকে অসাধু সাদৃশ্যানুমান বলে।

অপ্রকৃত বা অযথার্থ বা তথাকথিত আরোহ : যে সব অনুমানে সিদ্ধান্ত হিসেবে সার্বিক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং আপাত দৃষ্টিতে আরোহ বলে প্রতীয়মান হলেও যথার্থ অর্থে আরোহ নয় অর্থাৎ আরোহের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন-জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে উত্তরণ ও আরোহাত্মক উল্লম্ফন অনুপস্থিত থাকে সেসব যুক্তিকে অপ্রকৃত বা অযথার্থ বা তথাকথিত বা ভ্রান্ত আরোহ বলে। যেমন- একটি ঝুড়িতে রাখা সব ফল পরীক্ষা করে দেখা গেল সব ফল কমলালেবু এবং এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, এই ঝুড়ির সব ফল কমলালেবু।

অপ্রকৃত বা অযথার্থ আরোহ তিন প্রকার; যথা-

১. পূর্ণাঙ্গ আরোহ (Perfect Induction or Induction by Complete Enumeration)
২. যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ (Induction by Parity of Reasoning)
৩. ঘটনা সংযোজন (Colligation of Facts)

১. পূর্ণাঙ্গ আরোহ : যে আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের আওতাধীন সকল বিশেষ দৃষ্টান্তকে পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ করে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে পূর্ণাঙ্গ বা পূর্ণ গণনামূলক আরোহ বলে। যেমন- কোনো একটি বইয়ের তাকের প্রত্যেকটি বই পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে, প্রতিটি বই-ই উপন্যাস। সে ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, ঐ আলমারির সকল বই উপন্যাস।

২. যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ : যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ হলো এমন যুক্তি প্রক্রিয়া যেক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ ঘটনার প্রমাণের ভিত্তিতে সমজাতীয় সকল ঘটনা প্রমাণ করা যায় এবং এ নীতির উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়। যে যুক্তির ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বিষয় সম্পর্কে প্রমাণিত তথ্যের উপর নির্ভর করে, সমজাতীয় সব বিষয় সম্পর্কে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ বলে। যেমন- ABC একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজ এবং ABC এর তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান। এর মাধ্যমে সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, সকল (যে কোনো) ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

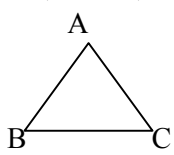

চিত্র :ত্রিভূজের তিনটি কোণ যথাক্রমে $\angle A+\angle B+\angle C$ = দুই সমকোণ

৩. ঘটনা সংযোজন : যে যুক্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষিত তথ্য সমূহকে মানসিকভাবে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় অথবা একটি ধারণার ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয় তাকে ঘটনা সংযোজন বলে। যেমন-

মঙ্গল গ্রহ কোন্ পথে সূর্যকে আবর্তন করে তা আবিষ্কারের লক্ষ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ে এ গ্রহ যেসব স্থানে অবস্থান করে সেসব স্থানের একটি তথ্য সংগ্রহ করেন বৈজ্ঞানিক জোনস্‌কেপলার (Johannes Kepler)। তাঁর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তিবিদ উইলিয়াম হিওয়েল (William Whewell) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকারের।
উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আরোহের শ্রেণিবিভাগ ছকের সাহায্য তুলে ধরা হলো :

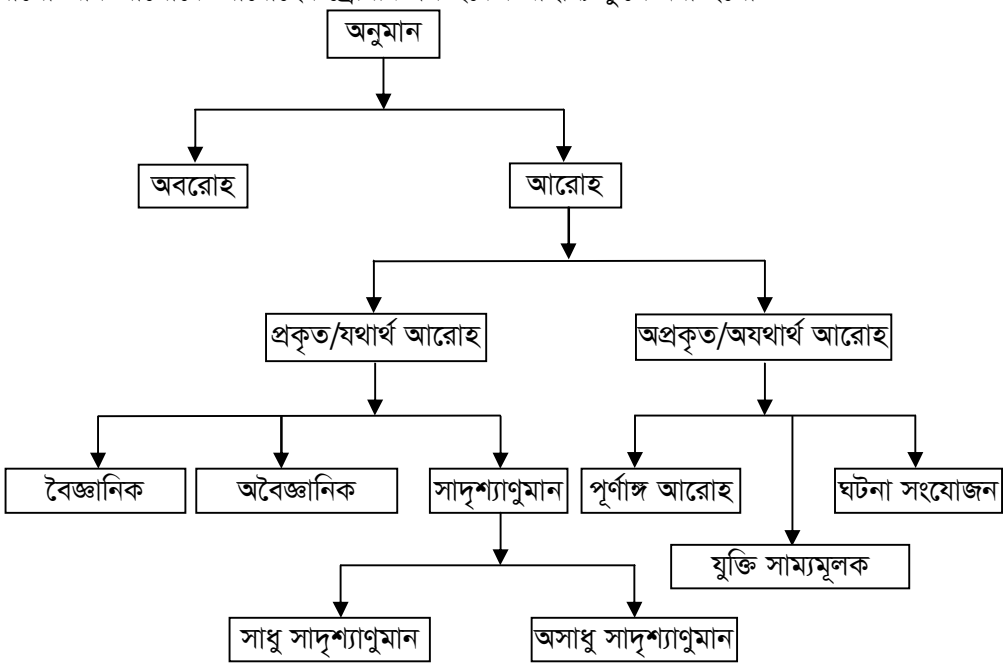

চিত্র: আরোহের শ্রেণিবিভাগ

শিক্ষার্থীর কাজ	আরোহ অনুমানের বিভিন্ন স্তরলিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

আরোহের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা প্রয়োজন। এ জন্য কতগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয় যেগুলোকে বলা হয় আরোহের স্তর। আমরা এই পাঠে আরোহের নয়টি স্তর সম্পর্কে জেনেছি। স্তরগুলো হলো: সংজ্ঞায়ন, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, শ্রেণিকরণ, অপনয়ন, প্রকল্প প্রণয়ন, সার্বিকীকরণ, যাচাইকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আরোহের সিদ্ধান্তটি সার্বিক সংশ্লেষক বাক্য হয় এবং এটি বৈজ্ঞানিক সত্য বা প্রকৃতির নিয়ম বলে বিবেচিত হয়। আরোহ দুই প্রকার: প্রকৃত বা যথার্থ এবং অপ্রকৃত বা অযথার্থ বা তথাকথিত আরোহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টি আরোহের স্তরভুক্ত নয়?
(ক) বিশ্লেষণ (খ) মূল্যায়ন (গ) সার্বিকীকরণ (ঘ) যাচাইকরণ

২। আরোহ অনুমান কত প্রকার?
(ক) ৫ (খ) ৪ (গ) ৩ (ঘ) ২

৩। বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে-
(i) প্রকৃতির একরূপতা নিয়ম ব্যবহার করা হয় (ii) কার্যকারণ নিয়ম ব্যবহার করা হয়
(iii) সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক)i, ii, ও iii (খ)i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

পাঠ-১০.৩ আরোহের প্রয়োজনীয়তা ও আরোহের ভিত্তি (Importance of Induction and Grounds of Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আরোহ অনুমানের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আরোহের ভিত্তিগুলো কি কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আরোহের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Induction) ঃ এরিস্টটল সর্বপ্রথম ইউরোপীয় দর্শনে জ্ঞান ও যুক্তির পদ্ধতি বিশ্লেষণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। এরিস্টটলের পরে আরোহী পদ্ধতির বিকাশ ঘটে আধুনিককালে প্রধানত ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon), গ্যালিলিও (Galileo), স্যার আইজাক নিউটন, (Sir Isaac Newton) জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) প্রমুখ বিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের হাতে। জ্ঞানের আরোহী পদ্ধতির বিকাশ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে আরোহী পদ্ধতির প্রয়োগ যেমন সহজতর করেছে তেমনি বিজ্ঞানের বিকাশ আরোহী পদ্ধতিকে সুবিস্তারিত ও সঠিক করে তুলেছে। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell)বলেন, বিজ্ঞানের সাধারণ নীতিমালা আমরা আরোহ নীতির মাধ্যমেই আবিষ্কার করি। জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় আরোহ যুক্তিবিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে আরোহের কয়েকটি প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো।

১. আমরা জানি, সহানুমানের দু'টি আশ্রয়বাক্যের একটিকে অবশ্যই সার্বিক বাক্য হতে হয়। আরোহ অনুমান অবরোহ অনুমানকে এ সার্বিক যুক্তিবাক্যটি সরবরাহ করে।

২. যুক্তিবিদ্যার মূল লক্ষ্য হলো অনুমানের আকারগত ও বস্তুগত সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা। অবরোহ অনুমান কেবল যুক্তির আকারগত সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, বস্তুগত সত্য নয়। যুক্তি বা অনুমানের বস্তুগত সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় আরোহ অনুমানের সাহায্যে। বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে আরোহ তার সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতা নিশ্চিত করতে পারে।

৩. আরোহ বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কারে সহায়তা করে। প্রতিটি বিজ্ঞান নিজ নিজ বিভাগের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কতগুলো সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করে। এক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতি প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

৪. আমাদের বিশ্ব প্রকৃতি বৈচিত্রময়। তবে প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব রয়েছে। যার ফলে এত বৈচিত্রের মাঝেও প্রকৃতিতে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির এ অন্তর্নিহিত ঐক্যবদ্ধ রূপ আরোহের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি।

৫. আরোহ পদ্ধতি ভবিষ্যত অনুসন্ধান কাজে সহায়তা করে।

৬. আরোহ অনুমান আমাদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার মুক্ত হতে সহায়তা করে। আরোহ অনুমানের সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি আবিষ্কারের ফলে অপ্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক বিষয়াবলির অসারতা সহজেই আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

৭. আমাদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনেও আরোহের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আরোহ প্রাকৃতিক নিয়মাবলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দেয় বলে প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা অগ্রিম অনুমান করতে পারি। তাই প্রকৃতি কখনো বিরূপ আচরণ করলে আমরা পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন জ্ঞান উৎকর্ষ সাধনের জন্য আরোহ অনুমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়।

আরোহের ভিত্তি (Grounds of Inductions) ঃ যে কাঠামোর উপর ভিত্তি করে কোনো বিষয় বা বস্তু দাঁড়িয়ে থাকে তাকে উক্ত বিষয় বা বস্তুর ভিত্তি বলা হয়। সে অনুযায়ী আরোহের ভিত্তি বলতে আরোহ অনুমান যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বোঝায়। অর্থাৎ যে সকল বিষয় বা শর্তের উপর নির্ভর করে আরোহ অনুমান আকারগত ও বস্তুগত উভয় দিক থেকে যথার্থ হয়ে ওঠে তাকে আরোহের ভিত্তি বলে। আরোহ অনুমানের মূল উদ্দেশ্য হলো আকারগত ও বস্তুগত উভয় ধরনের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা। এখানে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থাৎ একটি আকারগত বা রূপগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এখন যে নিয়মের ভিত্তিতে এই আকারগত পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ আকারগত দিক থেকে যুক্তিটি বৈধ হয়ে ওঠে, তাকে আকারগত ভিত্তি বলা হয়। আবার, এ অনুমানে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যাতে সিদ্ধান্তটি বাস্তবে অর্থাৎ বস্তুগত ভাবে সত্য হয়। তাহলে যে শর্তের উপর নির্ভর করে অনুমানটি বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে বা বস্তুগত দিক থেকে সত্য হয় তাকে বস্তুগত ভিত্তি বলা হয়। তাহলে দেখা যায় যে, আরোহের ভিত্তি দুই প্রকার; যথা-

১. রূপগত বা আকারগত ভিত্তি
২. বস্তুগত ভিত্তি

১. আকারগত ভিত্তি : আরোহের আকরগত ভিত্তি বলতে এমন মৌলিক নিয়মকে বোঝায় যেগুলোর উপর নির্ভর করে আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়। যুক্তিবিদদের মতে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করেই আমরা আরোহে বিশেষ থেকে সার্বিক সিদ্ধান্ত উপনীত হই।

তাই আরোহের আকারগত ভিত্তি হলো-

ক. প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি
খ. কার্যকারণ নিয়ম

২. বস্তুগত ভিত্তি : আরোহের বস্তুগত ভিত্তি বলতে এমন প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা আরোহ অনুমানের আশ্রয়বাক্যগুলো সরবরাহ করে এবং সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের সাহায্যে আরোহের উপাদান সংগ্রহ করা হয় বলে এবং এগুলো আরোহের সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করে বলে এদেরকে আরোহের বস্তুগত ভিত্তি বলা হয়। তাহলে আরোহের বস্তুগত ভিত্তি হলো দুটি; যথা-

ক. নিরীক্ষণ
খ. পরীক্ষণ

উপরোল্লিখিত আলোচনার আলোকে আরোহ অনুমানের ভিত্তিকে নিম্নোক্ত ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় :

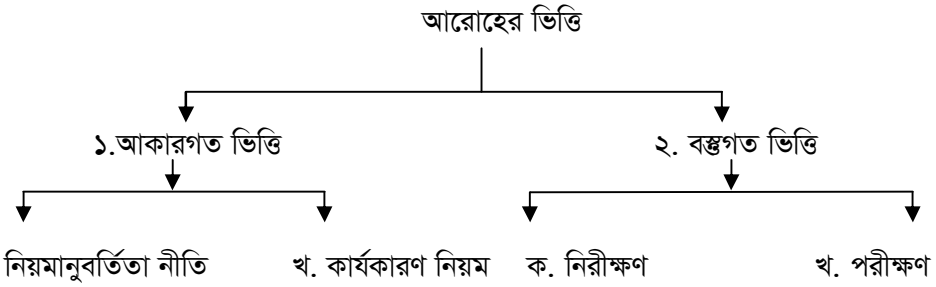

সারসংক্ষেপ

আরোহ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞান আজ চরম বিকাশ লাভ করেছে। এ অনুমানের মাধ্যমে জ্ঞানের বস্তুগত সত্যতা নিশ্চিত করা যায়। অবরোহ অনুমানের আশ্রয়বাক্যে যে সার্বিক যুক্তিবাক্য প্রয়োজন তা সরবরাহ করে আরোহ অনুমান। আরোহ বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও সত্য আবিষ্কারে সহায়তা করে। আরোহের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য দুই ধরনের ভিত্তির প্রয়োজন: রূপগত বা আকারগত ভিত্তি এবং বস্তুগত ভিত্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সহানুমানের সার্বিক বাক্যটি পাওয়া যায় কোন্ প্রক্রিয়ায়?
(ক) বিশ্লেষণ (খ) প্রত্যক্ষণ (গ) আরোহ (ঘ) অবরোহ

২। নিচের কোন্টি আরোহ অনুমানের ভিত্তি নয়?
(ক) কার্যকারণ নীতি (খ) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি (গ) পরীক্ষণ
(ঘ) প্রকৃতির ঘটনা

৩। আরোহ অনুমানের ভিত্তি কত প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

পাঠ-১০.৪ আকারগত ভিত্তি : প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এবং আরোহের কূটাভাস (Formal Ground of Induction: Law of Uniformity of Nature and Paradox of Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আরোহের আকারগত ভিত্তি হিসেবে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আরোহের কূটাভাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি (Law of Uniformity of Nature) ঃ আরোহ অনুমানে আমরা কতিপয় বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই বিশেষ জ্ঞান হতে সার্বিক জ্ঞানে উপনীত হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি। আমাদের চারপাশ, জীবজগত, জড়মন্ডল ও সকল প্রকার শক্তির সমষ্টিই হলো প্রকৃতি। এ প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষণ বা যাচাই করা যায়। প্রকৃতির মাঝে বিরাজমান ঘটনা প্রবাহের মধ্যে কিছু সাধারণ নিয়ম রয়েছে এবং প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনায় এ নিয়ম অনুসৃত হয়। প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান এ নিয়মই হলো প্রকৃতির নিয়ম।
প্রকৃতির ঐক্য বা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি হলো আরোহের আকারগত ভিত্তি। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি বিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক নিয়ম বলে একে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তবে যুক্তিবিদগণ বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করে নীতিটিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন:

১. প্রকৃতির রাজ্যে সম অবস্থায় একরূপ ঘটনা ঘটে
২. ভবিষ্যত অতীতকে অনুসরণ করবে
৩. প্রকৃতির রাজ্যে একতার নির্দেশনা বহাল থাকে
৪. অবর্তমান বর্তমানের মতোই হবে
৫. প্রকৃতিতে ইতিহাসের পূনরাবৃত্তি ঘটে
৬. প্রকৃতিতে একটি অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটলে ঘটনারও পুনরাবৃত্তি ঘটে
৭. প্রকৃতি নিয়মের রাজ্য
৮. প্রকৃতি একই রকম
৯. প্রকৃতিতে একই কারণ একই কার্য ঘটায়
১০. প্রকৃতি নিজের পুনরাবৃত্তি করে
১১. প্রকৃতিতে সমান্তরাল ঘটনা ঘটে
১২. প্রকৃতি একই অবস্থায় সমরূপ আচরণ করে।

এসব বক্তব্যের তাৎপর্য হলো প্রকৃতি সর্বত্রই অভিন্ন অবস্থায় একই আচরণ করে থাকে। প্রকৃতি নিয়মের উপাসক। এখানে জোরজবরদস্তি বা খাম-খেয়ালীর কোনো সুযোগ নেই। যদি পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে প্রকৃতিতে সর্বত্র একই আচরণ দেখা যায়। যুক্তিবিদ জেমস্ ওয়েল্টন(James Welton)মনে করেন, সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশিত হলেও এর লক্ষণ আসলে এক ও অদ্বিতীয়। যেমন- যে অবস্থায় কোনো স্থানে ভূমিকম্প হয়েছে, সেই একই অবস্থা যেসব স্থানে দেখা দিবে সেসব স্থানেও ভূমিকম্পের আবির্ভাব ঘটবে। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি ব্যাখ্যার জন্য আরো দু'টি ধারণা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

প্রকৃতিতে বৈচিত্র বিদ্যমান ঃ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি মূলত: একরূপতা প্রকাশ করলেও এই একরূপতার পাশাপাশি প্রকৃতিতে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র দেখা যায় বলে অনেকে এ নীতির সার্বজনীনতায় সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)ও যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (Carveth Read)একরূপতার পাশাপাশি প্রকৃতিতে বিভিন্নতার অস্তিত্বের কথা বলেন। তাঁরা প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনা। যেমন- রাজনীতি, ব্যবসা, বাতাস, জলবায়ু , ভূমিকম্প, তুফান, জলোচ্ছ্বাস, গ্রহন ইত্যাদির উল্লেখ করে এ নিয়মের সার্বজনীনতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতি আমাদের সাথে বড় অদ্ভুত আচরণ করে। এর উত্তরে বলা যায়, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির অর্থ এই নয় যে প্রকৃতিতে বৈচিত্র বলে কিছু নেই। এ নীতিতে বলা হয়েছে, একই অবস্থা বিরাজ করলে অথবা সমরূপ অবস্থা উপস্থিত থাকলে অতীতের মতো আগামীতেও প্রকৃতি একই আচরণ করবে।

প্রকৃতির নীতি এক নয়, বহু ঃ প্রকৃতির রাজ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন শাখার পর্যবেক্ষণ থেকে আবার কোনো কোনো যুক্তিবিদ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটিতে বহুত্ব আরোপ করে থাকেন। যুক্তিবিদআলেকজান্ডার বেইন (Alexander Bain)বলেন, সমগ্র প্রকৃতি একই নিয়মে চলে বলে মনে হয় না। তাই তিনি বলেন, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এক নয়, বহু। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি বিধি এক ধরনের নিয়মে ঘটে, উদ্ভিদ রাজ্যে চলে অন্য নিয়ম, আবার রাসায়নিক

পদার্থের ক্ষেত্রে এক ধরনের নিয়ম বিদ্যমান, অন্যদিকে মনোজগত বা শরীরবিদ্যার রয়েছে ভিন্ন নিয়ম। অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এক ও অভিন্ন নয়, প্রকতিতে বহু নিয়ম বিদ্যমান।

যারা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিতে বহুত্ব আরোপ করতে চান তাদের বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না। বিশেষ বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞানশাখা হিসেবে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, শিল্পকলা পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হলেও একই প্রকৃতি রাজ্যের সদস্য। অর্থ্যাৎ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানশাখা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। এখানে প্রকৃতি একটি এবং একমাত্র নিয়মের মাধ্যমে নয় বরং এক ও অভিন্ন নীতির আলোকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অসুবিধার জন্য যুক্তিবিদ জেমস্ ওয়েল্টন (James Welton) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি কথাটির পরিবর্তে একে প্রকৃতির একত্ব নীতি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য বিদ্যমান।

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি আরোহের আকারগত ভিত্তি ঃ 'প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা' এর অর্থ হলো প্রকৃতিতে কতগুলো অখন্ডনীয় নিয়ম আছে। এ নিয়মগুলোই প্রাকৃতিক ঘটনাবলিয় বৈষম্যের মাঝে ঐক্যসূত্র হিসেবে কাজ করে। আমরা প্রকৃতির এ ঐক্যসূত্র ও কার্যকারণ নিয়মের মাধ্যমে আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করি। আবার আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়ম-এ দু'টি প্রয়োজনীয় চিরন্তন ও সার্বজনীন নিয়মে আস্থা রাখি বলেই আরোহ অনুমানের বৈধতায় ও যথার্থতায় বিশ্বাস করি। আজ যে অবস্থায় যে কারণে যা ঘটলো, চিরকাল সে অবস্থায় সে কারণ উপস্থিত থাকলে তাই ঘটবে। এ নীতির উপর আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধতা বহুলাংশে নির্ভরশীল বলে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিকে আরোহের আকারগত ভিত্তি বলা হয়। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ নীতির কারণেই আরোহের ক্ষেত্রে জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ে উল্লম্ফন প্রদান করা যায়। এ নীতিটি কেবল বৈজ্ঞানিক আরোহের ক্ষেত্রেই নয়, অবৈজ্ঞানিক আরোহ ও সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির সাথে আরোহের সম্বন্ধ (Relation between the Law of Uniformity of Nature and Induction) ঃ আরোহ অনুমানে আমরা কতিপয় বাস্তব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি সার্বিক সংশ্লেষক বাক্য স্থাপন করি। আমরা কয়েকজন মানুষকে মরতে দেখি এবং তা থেকে সামান্যীকরণ করি যে, 'সকল মানুষ মরণশীল'। কিন্তু কয়েকজন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে সকল মানুষের মরণশীলতার সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের ভিত্তি কী? নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিতে, জানা থেকে অজানায়, কতিপয় থেকে সার্বিক বিষয়ে গমন করা কিভাবে সম্ভব হয়? এটা সম্ভব হয় এজন্য যে আমরা বিশ্বাস করি 'প্রকৃতি নিয়মের অধীন'। যদি কয়েকজন মানুষের মৃত্যুর প্রত্যক্ষণ সত্যি হয় তাহলে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই মরণশীলতা সত্য হবে- এটাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতিতে মানুষ হিসেবে কেউ জন্ম নিলে তার মৃত্যু হবে- এটাই প্রকৃতির বিধি। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) বলেন, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির পূর্ব ধারণার ভিত্তিতেই প্রতিটি আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিই হলো আরোহের রূপগত বা আকারগত ভিত্তি।

আরোহের কূটাভাস (Paradox of Induction) ঃ কূটাভাস শব্দের অর্থ হলো আপাত-বিরোধ। অর্থাৎ কূটাভাস হচ্ছে এমন মতবাদ যা আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত কিন্তু বাস্তবে সত্য। যে মতবাদ আপাত দৃষ্টিতে আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে স্ববিরোধী বলে মনে হয়, কিন্তু যথার্থ বিচারে অসঙ্গত বা স্ববিরোধী বলে প্রমাণিত হয় না, তাকে আরোহ অনুমানের আপাত অসঙ্গত মতবাদ বা কূটাভাস বলে।

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি আরোহ অনুমানের একটি আকারগত ভিত্তি। প্রত্যেক আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে এ নীতিকে স্বীকার করে নিতে হয়। তা না হলে আরোহ অনুমান সম্ভব হয় না। কারণ, এ নীতির ভিত্তিতেই বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে আরোহ অনুমানে সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। এ কারণেই জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিকে আরোহের অন্যতম রূপগত বা আকারগত ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর পূর্ববতী মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যহীনভাবে বলেন যে, নীতিটি নিজেই একটি আরোহ অনুমানের দৃষ্টান্ত। কারণ, তিনি মনে করেন যে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটির উৎপত্তি হয়েছে কতগুলো অনুকূল দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা থেকে। এক্ষেত্রে কোনো প্রতিকূল দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা গ্রহন করা হয় নি। আমরা ছোট বেলা থেকে দেখি আগুন দহন করে, পানি পিপাসা মিটায়, খাদ্য ক্ষধা নিবারণ করে। এর বিপরীত কোনো ঘটনা বা দৃষ্টান্ত আমরা দেখি না। এরূপ ঘটনা বারবার ঘটতে দেখে আমরা বিশ্বাস করতে শিখি যে, এ ঘটনাগুলো একই অবস্থায় একইভাবে ঘটবে। এগুলো হলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ নিয়মানুবর্তিতার দৃষ্টান্ত। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) বলেন যে, আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ্য করে তা থেকে সাধারণ নিয়মানুবর্তিতা অনুমান করি। অর্থাৎ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর মতে, নিয়মানুবর্তিতা নীতি হলো বহু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ নিয়মানুবর্তিতা নীতির দৃষ্টান্ত অপূর্ণ গণনামূলক আরোহের ভিত্তিতে সাধারণীকরণ বা সার্বিকীকরণ। তাহলে দেখা যায়, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি আরোহ অনুমানের ফল। এখানে মিলের বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, আরোহের

ভিত্তি একটি আরোহ। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি সম্পর্কে মিলের এই পরস্পর বিরোধী বা স্ববিরোধী বক্তব্যকেই আরোহের আপাত অসঙ্গত মতবাদ বা আরোহের কূটাভাস বলে।

বিশ্লেষণ : অনেক যুক্তিবিদ মিলের আপাত বিরোধী বা অসঙ্গত মতবাদকে ভ্রান্ত বলে বিবেচানা করেছেন। যেসব যুক্তিতে মিলের স্ববিরোধী মতবাদ অগ্রহনযোগ্য সেগুলো হলো :

প্রথমত : মিলের যুক্তিটি চক্রক অনুপপত্তি দোষে দুষ্ট। তিনি যে বিষয়টি প্রমাণ করতে চেয়েছেন সেটিকে প্রথমেই তিনি সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। তিনি প্রথমে বলেছেন যে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি হচ্ছে আরোহের ভিত্তি এবং পরে বলেছেন এ নিয়মটি হলো আরোহের ফল অর্থাৎ আরোহের অনুমিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু যদি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি আরোহের ভিত্তি হয় তাহলে এ নীতিটি আরোহের সিদ্ধান্ত হতে পারে না। কারণ একই বিষয়ের পক্ষে কোনো কিছুর ভিত্তি ও ফল উভয়ই হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত: বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত কিন্তু অপূর্ণ গণনামূলক আরোহের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিই অপূর্ণ গণনামূলক আরোহের ফল বা সিদ্ধান্ত হলে নিয়মটি স্বভাবতই সম্ভাব্য হবে। আমরা জানি, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি হবে বৈজ্ঞানিক আরোহের ভিত্তি। কিন্তু যা সম্ভাব্য তা কখনো নিশ্চিত বিষয়ের ভিত্তি হতে পারে না। অর্থাৎ সম্ভাব্যতা নিশ্চিত বিষয়ের ভিত্তি হবে এটা যৌক্তিক নয়।

তৃতীয়ত: জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)- এর এ পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের আসল কারণ হলো তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ। অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয় জ্ঞান জনিত অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তাই মিল মনে করেন যে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি অভিজ্ঞাতার মাধ্যমেই অনুমিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি একটি মৌলিক নিয়ম বা পরম নিয়ম। মৌলিক নিয়মগুলোকে প্রমাণ করা যায় না, সত্য বলে মেনে নিতে হয়।জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এ বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন অথবা তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যা যথার্থ নয়। সুতরাং প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটি আরোহের ভিত্তি, আরোহের ফল নয়।

সারসংক্ষেপ

আরোহের রূপগত বা আকারগত ভিত্তি হলো দুইটি: প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিত নীতি ও কার্যকারণ নিয়ম। প্রকৃতিতে একই অবস্থা বিরাজ করলে একই ঘটনা ঘটে। সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য বিদ্যমান। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির পূর্ব ধারণার ভিত্তিতেই প্রতিটি আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যুক্তিবিদ মিল বলেন, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি আরোহের ভিত্তি, আবার এই নীতিটি নিজেই আরোহ অনুমানের একটি দৃষ্টান্ত। একে আরোহের কূটাভাস বা আরোহ অনুমানের আপাতঃ অসঙ্গত মতবাদ বলে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে মিলের এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। 'আরোহের কূটাভাস' ধারণাটির প্রবক্তা কে ?

(ক) এরিস্টটল (খ) মিল (গ) বেইন (ঘ) হিউয়েল

২। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির ব্যাখ্যায় বলা যায়-

(i) সামনের সময় পিছনের সময়ের মতই হবে (ii) প্রকৃতির সর্বত্রই পূণরাবৃত্তি বিদ্যমান

(iii) প্রকৃতিতে নিয়মই সব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i,ii, ও iii (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ)i ও iii

৩। 'প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি হচ্ছে মৌলিক নিয়ম'- নিম্নের কোন্ যুক্তিবিদ এ নিয়ম সমর্থন করেন না?

(ক) এরিস্টটল (খ) মিল (গ) যোসেফ (ঘ) বেন

পাঠ-১০.৫ আকারগত ভিত্তি : কার্যকারণ নীতি (Formal Ground of Induction: The Law of Cousation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কার্যকারণ নীতির অর্থ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কারণের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- শর্তের স্বরূপ জানতে পারবেন।
- কারণ ও শর্তের পার্থক্য আলোচনা করতে পারবেন।
- কারণ ও শর্তের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।
- কারণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কার্যকারণ নীতি (Law of Causation) ঃ আরোহের আরেকটি আকারগত ভিত্তি হলো কার্যকারণ নিয়ম। আরোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কার্যকারণ সিয়ম অনুসরণ করা হয়। কার্যকারণ নিয়মের মানে হলো জগতে এমন কোনো কাজ নেই যার পিছনে কোনো কারণ নেই, এবং জগতে এমন কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না যার পরে কোনো কাজ ঘটে না। অর্থাৎ জগতের প্রতিটি ঘটনার একটি কারণ রয়েছে। যা কিছু ঘটে তা কোনো না কোনো কারণবশত ঘটে। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) বলেন, যে ঘটনার আরম্ভ আছে তার অবশ্যই একটা কারণ আছে। যুক্তিবিদআলেকজান্ডার বেইন (Alexander Bain)বলেন, যে ঘটনা ঘটে তা সকল ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী এমন একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত থাকে যা ঘটলে ঘটনাটি ঘটে এবং না ঘটলে ঘটনাটি ঘটে না (Every event that happens definitetey connected with some prior event, which happening happens; which failing, it fails.)। যেমন-কোনো পিপাসার্ত ব্যক্তি পানীয় পান করলে পিপাসা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু পানীয় পান না করলে পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। এখানে পানি পান করা হলো কারণ এবং পিপাসা নিবৃত্ত হওয়া হলো কার্য।
নঞর্থকভাবে বলা যায়, কারণ ব্যতীত কোনো কার্যই ঘটে না। নিছক শূন্য থেকে কেবল শূন্যই আসে (Ex-nihilo nihil fit)। শূন্য থেকে কোনো কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না (No change arises out of vacuity stillness.-Bain)। অর্থাৎ যেখানে কোনো কারণ নেই সেখানে কোনো কার্য থাকতে পারে না।

কার্য-কারণ হলো একটি মৌলিক নিয়ম। কার্য ও কারণের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কই এর মৌলিকতার প্রমাণ। কার্য ও কারণের অনিবার্য সম্পর্কের মানে হলো, যখন কোনো কার্য ঘটবে তখন অবশ্যই তার পিছনে কারণ থাকবে। আবার, কোনো কারণ ঘটলে তা থেকে অবশ্যই কোনো কার্যের উৎপত্তি হবে। নিম্নে কার্যকারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ তুলে ধরা হলো :

কার্যকারণ সম্পর্কে এরিস্টটলের মতবাদ (Aristotles View on Causation) ঃ এরিস্টটলের মতে, কারণ একটি জটিল ঘটনা। এটা মোটেই সরল নয়। কারণের স্বরূপ বিশ্লেষণের সময় তিনি একটি কার্যের উৎপত্তির পিছনে চার ধরনের কারণের কথা বলেন: উপাদান কারণ (material cause), আকারগত কারণ (formal cause) নিমিত্ত কারণ (efficient cause) ও পরিণতি কারণ (final cause)। একটি মূর্তি তৈরি করতে হলে উপাদান প্রয়োজন, আকার প্রয়োজন, শক্তি-কৌশল-যন্ত্রপাতি সহযোগে নিমিত্ত প্রয়োজন, এবং চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে আমরা একটি মূর্তি পাই। এরিস্টটল উপাদান ও আকারকে অভ্যন্তরীণ কারণ বলেছেন এবং নিমিত্ত ও পরিণতিকে বাহ্যিক কারণ বলেছেন।

কারণ ও শর্ত (Cause and Condition) ঃ আমাদের এ জগত পরিবর্তনশীল। প্রতি মুহূর্তে নতুন ঘটনা ঘটছে এবং বস্তুজগত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিবর্তন কেন এবং কিভাবে হয় তার উত্তর খুঁজতে গিয়েই আমরা কারণের সন্ধান পাই। কারণ হচ্ছে এমন কিছু যার মধ্যে এমন শক্তি আছে যার প্রভাবে একটি বস্তুর পরিবর্তন হয় বা একটি ঘটনার উৎপত্তি হয়। আবার, কারণ আকস্মিকভাবে তৈরি হয় না। কারণের অংশ বা উৎপাদক রয়েছে যাকে শর্ত বলা হয়। যখন কোনো কার্য অনেকগুলো পূর্বগামী ব্যাপার বা অবস্থার সমাবেশে ঘটে তখন এই ব্যাপারগুলোও হয় শর্ত। নিচে কারণ ও শর্তের সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো।

কারণের সংজ্ঞা (Definition of Cause) ঃ দার্শনিক ডেভিড হিউম (David Hume) কারণের সংজ্ঞায় বলেন, যে বিষয় অন্য কোনো বিষয়কে অনুসরণ করে, যার উপস্থিতির ফলে অন্য বিষয়ের উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি তাই হলো কারণ। যেমন- আমরা দূরবর্তী কোনো স্থানে ধোঁয়া দেখলে আগুনের কথা চিন্তা করি; সুতরাং আগুন হলো ধোয়ার কারণ। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর 'A System of Logic' গ্রন্থে বলেন, কোনো ঘটনার কারণ হলো সেই পূর্বগামী বিষয় বা বিষয় সমূহের সমষ্টি যাকে ঘটনাটি শর্তহীন ও অপরিবর্তনীয় ভাবে অনুসরণ করে।যুক্তিবিদআলেকজান্ডার বেইন (Alexander Bain) তাঁর '*Logic*' গ্রন্থে বলেন, কারণ হলো কার্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও পারিপার্শ্বিক

ঘটনাবলির সমষ্টি। যেসব অপরিহার্য শর্তাবলি ও প্রয়োজনীয় ঘটনাংশ বা উৎপাদক উপস্থিত থাকলে একটি কার্য ঘটে তাই হলো কারণ। যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (Carveth Read) কারণের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, গুণগতভাবে কারণ হলো কার্যের অব্যবহিত শর্ত নিরপেক্ষ ও অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনাবলির সমষ্টি।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা কারণের সংজ্ঞায় বলতে পারি যে, কারণ হলো এমন একটি বাস্তব পূর্ববর্তী ঘটনা যা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থেকে শর্ত নিরপেক্ষ ও অপরিবর্তনীয়ভাবে একটি কার্য ঘটায়। যেমন- পানি উত্তপ্ত করা হলে তা বাষ্পে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে গুণগত দিক থেকে পানির উত্তপ্তকরণ হলো কারণ, আর বাষ্প হলো কার্য। অন্যদিকে পরিমাণগত দিক থেকে যতটুকু পানি উত্তপ্ত করা হয় ঠিক ততটুকু বাষ্প পাওয়া যায়।

শর্তের সংজ্ঞা (Definition of Conditon) ঃ কারণের অপরিহার্য অংশ হলো শর্ত। শর্তের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (Carveth Read) বলেন, "শর্ত হলো কারণের এমন সব অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় উপাদান যা শক্তি সঞ্চারন, শোষণ, রূপান্তর বা বিক্ষেপণ করে।" একথার অর্থ হলো যা কিছু কার্য সংগঠনের জন্য কারণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে তাই হলো শর্ত। যেমন- কোনো এলাকায় আন্দোলনের ফলে প্রশাসন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং এলাকায় দুনীর্তি বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে এলাকার বিদ্যমান সমস্যা, সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের ব্যর্থতা, গণ আন্দোলন, গণআন্দোলনের ফলে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদির ফলে এলাকার দুনীর্তি বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে এলাকার দুনীর্তি বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকটা ঘটনা হলো শর্ত। আর এসব শর্তের সমষ্টিগত রূপই হলো কারণ।

শর্তের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে যুক্তিবিদগণ দুই প্রকার শর্তের কথা বলেন; যথা-

ক. সদর্থক শর্ত
খ. নঞর্থক শর্ত

সদর্থক শর্ত : জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এরমতানুসারে, যেসব শর্ত উপস্থিত থাকলে একটি কার্য সংঘটিত হয় তাদের সদর্থক শর্ত বলে।

নঞর্থক শর্ত : জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) বলেন, যে সব শর্ত অনুপস্থিত থাকলে একটি কার্য সংঘটিত হয় তাদের নঞর্থক শর্ত বলে।

কারণ ও শর্তের পার্থক্য (Defferences between Cause and Condition) ঃ কারণ ও শর্তের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে এদের মধ্যে কতগুলো পার্থক্য দেখা যায়। কারণ ও শর্তের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য নিচে তুলে ধরা হলো:

১. কারণ হলো এমন ঘটনা যা কার্য উৎপন্ন করে। আর শর্ত হলো কার্য সংঘটনের জন্য দায়ী কারণের একেকটি অংশ।
২. কোনো একটি কার্যকে বিশ্লেষণ করলে একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ কার্যকে বিশ্লেষণ করলে একাধিক শর্ত পাওয়া যায়।
৩. কারণকে গুণগত ও পরিমাণগত এই দুই দিক থেকে বিচার করা যায়। কিন্তু শর্তকে সদর্থক ও নঞর্থক এই দুই দিক থেকে বিচার করা যায়।
৪. কারণ হলো কার্যের অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনাবলির সমষ্টি। কিন্তু শর্ত হলো কার্যের পরিবর্তনশীল পূর্ববর্তী ঘটনা।
৫. কারণ কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা । কিন্তু শর্ত কার্যের দূরবর্তী পূর্ববর্তী ঘটনা হতে পারে।
৬. পরিমাণগতভাবে কারণ কার্যের সমান। কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে কোনো একক শর্ত কার্যের সমান নয়।
৭. যে কোনো কারণকে শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু যে কোনো শর্তকে সমগ্র কারণরূপে বিবেচনা করা যায় না।
৮. কারণ বিশ্লেষণ করলে কার্য পাওয়া যায়; কিন্তু কোনো শর্তকে বিশ্লেষণ করলে কার্য পাওয়া যায় না।

কারণ ও শর্তের সম্পর্কঃ

কারণ ও শর্তের সম্পর্ককে তিনভাবে বিশ্লেষণ করা যায়; যথা-

ক. পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণ
খ. আবশ্যিক শর্ত হিসেবে কারণ
গ. পর্যাপ্ত ও আবশ্যিক শর্ত হিসেবে কারণ

ক. পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণ (Cause as a Sufficient Condition) ঃ একটি কারণ তখনই পর্যাপ্ত শর্ত হয় যখন কারণটি উপস্থিত থাকলে কার্যটি ঘটবেই। কিন্তু ঘটনাটিতে যে পর্যাপ্ত শর্তটি উপস্থিত থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অর্থাৎ পর্যাপ্ত শর্ত উপস্থিত থাকলে ঘটনাটি ঘটবেই। কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত না থাকলেও ঘটনাটি ঘটতে পারে। এর মানে হলো একই ঘটনার একধিক পর্যাপ্ত শর্ত থাকতে পারে। যেমন- রুমের অন্ধকার দূর করার জন্য বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো একটি পর্যাপ্ত শর্ত। কিন্তু কেরোসিনের কুপি জ্বালানো, গ্যাস বার্নার জ্বালানো, মোমবাতি জ্বালানো, হারিকেন জ্বালানো এক একটি পর্যাপ্ত শর্ত। কাজেই যে কোনো একটি পর্যাপ্ত শর্ত উপস্থিত হলেই কার্যটি উৎপন্ন হয়।

খ. আবশ্যিক শর্ত হিসেবে কারণ (Cause as Necessary Condition) ঃ যে শর্তটি কার্যের উৎপত্তির জন্য আবশ্যিক বা

অনিবার্য সে শর্তটিকে বলা হয় আবশ্যিক শর্ত। কোনো একটি ঘটনার আবশ্যিক শর্ত হলো এমন একটি অবস্থা যার অনুপস্থিতিতে ঘটনাটি ঘটতে পারে না। অর্থাৎ কোনো ঘটনা ঘটলে তার আবশ্যিক শর্ত উপস্থিত থাকবেই। যেমন- আগুন জ্বালার জন্য অক্সিজেনের উপস্থিতি একটি আবশ্যিক বা অপরিহার্য শর্ত। আগুন জ্বলার জন্য অক্সিজেনের উপস্থিতি একান্তভাবে আবশ্যক। কারণ অক্সিজেন না থাকলে আগুন জ্বলতে পারে না।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি:

- ❖ A একটি পর্যাপ্ত শর্ত B এর জন্য: A ঘটলে B ঘটবে।
- ❖ A, B এর জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত: B ঘটতে হলে A এর উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন।

গ. আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণ (Cause as Necessary and Sufficient Condition) ঃ আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণকে গ্রহণ করলে আমরা দেখি যে, কারণ যেমন কার্যের অব্যবহিত ও অপরিবর্তনশীল পূর্ববর্তী ঘটনা তেমনি কার্য হলো কারণের অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা। অর্থাৎ কারণকে আমরা পর্যাপ্ত ও আবশ্যিক শর্ত হিসেবে গ্রহণ করি বলেই কার্য থেকে কারণ এবং কারণ থেকে কার্য অনুমান করতে পারি। এক্ষেত্রে সকল আবশ্যিক শর্তের সমষ্টিই হবে পর্যাপ্ত শর্ত যা কার্যের একমাত্র কারণ বলে গণ্য হয়। এ অর্থে একটি কার্যের একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে। যেমন- মৃত্যু হলো একটি ঘটনা যার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত হলো হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া।

কারণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Cause) ঃ যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (Carveth Read) তাঁর *Logic: Deductive and Inductive* বইয়ে কারণের দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন; যথা-১.গুনগত বৈশিষ্ট্য, এবং ২.পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য

কারণের গুনগত বৈশিষ্ট্য (Qualitative Marks of Cause) ঃ

১. কারণ একটি বাস্তব ঘটনা। কারণ এমন একটি বাস্তব ঘটনা যাকে অন্য কোনো ঘটনা অনুসরণ করে এবং যার উপস্থিতি অন্য একটি ঘটনা ঘটায়।
২. কারণ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকে। যেকোন বাস্তব ঘটনার উপস্থিতি সম্পন্ন হয় কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে। কারণ একটি বাস্তব ঘটনা বলে তা কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকে।
৩. কারণ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকে। কার্যও কারণ দুটি পূর্বাপর ঘটনা যার একটি অপরটিকে অনুসরণ করে। একটি স্থিত ঘটনা অপর ঘটনাটিকে অনুসরণ করার জন্য উভয় ঘটনাকেই কোনো নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকতে হয়।
৪. কারণ একটি প্রত্যক্ষণযোগ্য ঘটনা। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকে বলে তা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়।
৫. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কারণ ও কার্যকে প্রাকৃতিক ব্যাপার (Natural Phenomena) বলে মনে করা হয়।
৬. কারণের একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য হলো কার্যের পূর্বে উপস্থিতি। কোনো ঘটনাকে (Fi)অন্য একটি ঘটনার (F_2) কারণ হতে হলে তাকে (Fi) পূর্বাগামী হতেই হবে। তবে কারণ কার্যের অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা। কোনো ঘটনা (Fi) যদি অপরিবর্তনীয় রূপে অন্য একটা ঘটনাকে (F_2) অনুসরণ করে তাহলে পূর্ববর্তী ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।
৭. কারণ কার্যের শর্ত নিরপেক্ষ পূর্ববর্তী ঘটনা। কারণ কার্যের অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা হলেও তাকে অবশ্যই শর্ত নিরপেক্ষ হতে হবে; যে কোনো পূর্ববর্তী ঘটনা কারণ হতে পারে না। যেমন- দিন রাতের অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা । কিন্তু তা সত্ত্বেও দিন রাতের কারণ নয়। দিন ও রাতের মধ্যে সময়গত দিক থেকে পূর্বাপর সম্পর্ক থাকলেও উভয় হলো পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তনের ফলে সৃষ্ট দু'টি ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা হলো শর্ত সাপেক্ষ ঘটনা। এরূপ শর্ত সাপেক্ষ দু'টি ঘটনা একই কারণের ফলে সৃষ্ট কার্য বলে এদের সহকার্য বলা হয়।
৮. কোনো অপরিবর্তনীয় শর্ত নিরপেক্ষ ঘটনা (Fi) অন্য একটি ঘটনার (F_2) কারণ হতে পারে। তবে ঘটনাটিকে (Fi) অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা হতে হয়। কোনো দূরবর্তী (remote) ঘটনা অন্য ঘটনার কারণ হতে পারে না। ভূমিকম্পে ঘরের ছাদ ভেঙ্গে একটি লোকের উপর পড়ে যাওয়ায় তার মৃত্যু হলো। এক্ষেত্রে ভূমিকম্প লোকটির মৃত্যুর দূরবর্তী পূর্ববর্তী ঘটনা এবং ছাদের পতন অব্যবহিত পূর্বগামী ঘটনা। সুতরাং ভূমিকম্পকে লোকটির মৃত্যুর কারণ না বলে ছাদটির পতনকেই তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বলে মনে করা উচিত। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা বা ঘটনাবলি অনিরীক্ষিত রেখে কোনো দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হলে দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহনজনিত অনুপপত্তি ঘটে।
৯. কারণ একটি যৌগিক ঘটনা। কারণ হলো কার্যের অপরিবর্তনীয়, শর্ত নিরপেক্ষ ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর মতে, কারণ হলো কার্যের পূর্ববর্তী সদর্থক ও নঞর্থক শর্তসমূহের সমষ্টি। সে অনুসারে বলা যায়, কারণ কোনো সরল ঘটনা নয় বরং যৌগিক ঘটনা। কার্যের ক্ষেত্রে যেসব ঘটনা উপস্থিত ও অনুপস্থিত থাকার ফলে কার্য সংঘটিত হয় তাদের সমষ্টিকে কারণ বলে। কোনো ক্ষেত্রে কারণকে কার্যের পূর্ববর্তী ঘটনাবলির সমষ্টি হিসেবে বিবেচনা করার পরিবর্তে কেবল একটি ঘটনাকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হলে শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণ কিংবা নঞর্থক শর্তকে অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

কারণের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য (Quantitative Marks of Cause) ঃ পরিমাণগতভাবে কারণ ও কার্য সমান। অর্থাৎ কারণের বস্তু ও শক্তির পরিমাণ কার্যের বস্তু ও শক্তির পরিমাণের সমান। এরূপ পরিমাণগত সমতার বিষয়টি নিম্নোক্ত দু'টি

নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়:

১. বস্তুর অবিনশ্বরতা নিয়ম : এ নিয়মানুসারে জগতে মোট বস্তুর পরিমাণ সকল সময় সমান থাকে। এর মানে হলো, বিশ্বে বস্তুর মোট পরিমাণ অবিনশ্বর বা সব সময় স্থায়ী ও অপরিবর্তিত থাকে। বস্তুর এ পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। তবে বস্তু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে। নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সাথে মেশালে পানি উৎপন্ন হবে। কিন্তু পানির ওজন এবং অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে মিলিত ওজনের ঠিক সমান। অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস দু'টিকে পানিতে রূপান্তরিত করা হলে তাদের রূপের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু তাদের পরিমাণ সমান বা অপরিবর্তিত থাকে।

২. শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়ম : এর মানে হলো জগতে মোট শক্তির পরিমাণ অবিনশ্বর বা অপরিবর্তিত থাকে। জগতে মোট শক্তির পরিমাণ বাড়েও না, কমেও না। শুধু এক প্রকার শক্তি অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তর হতে পারে। বিদ্যুতকে তাপে বা আলোক শক্তিতে রূপান্তর করা হলে শক্তির পরিমাণের কোনো তারতম্য ঘটে না। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শক্তি দু'টি রূপে বিদ্যমান থাকে; যথা- সুপ্ত শক্তি (Potential energy) ও গতি শক্তি (Kinetic energy)। সুপ্ত শক্তি গতি শক্তিতে এবং গতি শক্তি সুপ্ত শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

আরোহের সাথে কার্যকারণ নিয়মের সম্পর্ক (Relation between Induction and the Law of Causation)

আরোহ অনুমানের দুটি আকারগত ভিত্তির মধ্যে কার্যকারণ নিয়ম হলো একটি। আরোহ অনুমান প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করতে হয়। কার্যকারণ নিয়মের উপরই আরোহ অনুমানের যথার্থতা নির্ভরশীল। দু'টি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে একটি সামান্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাই হলো আরোহ অনুমানের মূল লক্ষ্য। তবে কোনো ঘটনার কারণ আবিষ্কারের পূর্বে আমাদের মেনে নিতে হয় যে, প্রকৃতির সকল ঘটনাই কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। অর্থাৎ যা কিছু ঘটে তার একটি কারণ আছে। কারণ ব্যতীত কোনো কিছুই ঘটে না। তাই এ নিয়মের উপর আস্থাশীল হয়ে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমরা দুটি ঘটনার মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করি। এরপর একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। যেমন, বিভিন্ন দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা স্ত্রী এনোফিলিশ মশার কামড় ও ম্যালেরিয়া রোগের মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করি। এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, স্ত্রী এনোফিলিশ মশার কামড় হলো ম্যালেরিয়া রোগের কারণ।

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের সম্পর্ক ঃ (Relation between the Law of Uniformity of Nature and the Law of Causation) ঃ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে যুক্তিবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ কারণে এ বিষয় সম্পর্কে তিনটি মতের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

প্রথমত: জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), বেন,জন ভেন (John Venn) ও অন্যান্যদের মতে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি হচ্ছে মৌলিক নিয়ম; কার্যকারণ নিয়ম তার একটি বিশেষ রূপ মাত্র। কার্যকারণ নিয়মটি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির একটি বিশেষ রূপ। কারণ, কার্যকারণ নিয়ম দ্বারা এটাই বোঝায় না যে প্রত্যেক ঘটনারই একটা কারণ আছে, বরং এটাও বোঝায় যে, একই কারণ থেকে একই রূপ কার্য ঘটবে। এভাবে কার্যকারণ নিয়মটিকে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

দ্বিতীয়ত:এইচ ডব্লিউ বি যোসেফ (H.W.B. Joseph), এস. এইচ. মেলোন (S.H. Mellone) প্রমুখ যুক্তিবিদের মতে, কার্যকারণ নিয়মটিই হচ্ছে মৌলিক এবং প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটা এর অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃতির সকল ঘটনাই কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। কার্য ও কারণের মধ্যে একটি অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে। যেখানে কার্য থাকে সেখানে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে এবং একই কারণ থেকে একই কার্যের উৎপত্তি হয়। এ নিয়ম মেনেই প্রকৃতিতে নিয়মের নীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে আমাদের ধারণার মূলে রয়েছে কার্য ও কারণের অনিবার্য সম্পর্ক।

তৃতীয়ত: বোসাঙ্কে (Bernard Bosanquet), খ্রিস্টফ ভন সিগওয়ার্ট (Christophvon Sigwart) ওযুক্তিবিদ জেমস্ ওয়েল্টন (JamesWelton) প্রমুখ দার্শনিকের মতে, কার্যকারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা মৌলিক নিয়ম। তাঁদের মতে, কার্যকারণ নিয়ম আমাদের এটা বলে যে প্রত্যেক ঘটনারই একটি কারণ আছে। কার্যকারণ নিয়মের সাহায্যে আমরা দু'টি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার ও প্রমাণ করার চেষ্টা করি। কিন্তু সামান্যীকরণের মাধ্যমে এরূপ একটি সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করি। কারণ, কার্য ও কারণ প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কারণ ও শর্তের মধ্যে পার্থক্যেরএকটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

আরোহের আরেকটি আকারগত ভিত্তি হলো কার্যকারণ নিয়ম। এ নিয়ম অনুসারে জগতের প্রতিটি কার্যের পিছনে একটি কারণ রয়েছে। দুটি পূর্বাপর ঘটনা এমনভাবে সম্পর্কিত যে পূর্ববর্তী ঘটনাটি ঘটলে পরবর্তী ঘটনাটি ঘটে এবং এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ঘটনাটিকে বলা হয় কারণ এবং পরবর্তী ঘটনাটিকে বলা হয় কার্য। এরিস্টটল চার ধরনের কারণের কথা বলেছেন: উপাদান, আকার, নিমিত্ত ও চূড়ান্ত কারণ। কারণের আবশ্যিক অংশ হলো শর্ত। একটি কার্যের ক্ষেত্রে একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায়; কিন্তু একটি কার্যের ক্ষেত্রে একাধিক শর্ত থাকতে পারে। কারণের দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে: গুণগত ও পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। একটি কার্য উৎপত্তির পিছনে কয়টি কারণ ক্রিয়াশীল বলে এরিস্টটল মনে করেন?

(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২। শর্তের বৈশিষ্ট্য হলো-

(i) কার্যের দূরবর্তী পূর্ববর্তী ঘটনা

(ii) শর্তকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক- এই দুইভাবে বিবেচনা করা যায়

(iii) একটি কার্যের পশ্চাতে একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল থাকতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

৩। কারণের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়-

(i) নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকে

(ii) ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণযোগ্য ঘটনা

(iii) একমাত্র অতি-প্রাকৃতিক শক্তিই কারণকে ধরতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

পাঠ-১০.৬ বহুকারণবাদ, বহুকারণ সমন্বয় ও কার্য সংমিশ্রণ (Plurality of Causes, Conjunction of Causes and Intermixture of Effects)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বহুকারণবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বহুকারণ সমন্বয় বলতে কি বুঝায় তা জানতে পারবেন।
- কার্য-সংমিশ্রণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বহুকারণবাদ (Plurality of Causes) ঃ কারণকে পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে বিবেচনা করার ফলে বহুকারণবাদ নামক তত্ত্বের প্রচলন হয়েছে। এ তত্ত্বের মূলকথা হলো একই কার্যের একাধিক তথা বহু করণ থাকতে পারে। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) সর্বপ্রথম কারণের বহুত্ব কথাটি প্রবর্তন করে। যুক্তিবিদ আলেকজান্ডার বেইন (Alexander Bain) বহুকারণবাদ কথাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বহুকারণবাদ অনুসারে, একই কার্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে।

বহুকারণবাদের প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এ প্রসঙ্গে বলেন, একই কার্য যে একই কারণ দ্বারা সম্পন্ন হবে এমন কোনো কথা নেই। এমন কোনো কথা নেই যে, একটি ঘটনা কেবল একইভাবে সম্পন্ন হবে। অনেক সময় একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে ঘটতে পারে। অনেক রকম কারণ বস্তু বিশেষের গতি সম্পন্ন করতে পারে, একই সংবেদনের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, মৃত্যু বিভিন্নভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

বহুকারণবাদ সম্পর্কে যুক্তিবিদআলেকজান্ডার বেইন (Alexander Bain) বলেন,একই কার্য সব সময় একই কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয় না। একটা কার্যের বহু করণ থাকতে পারে।

বহুকারণবাদের তাৎপর্য হলো একই কার্যের একাধিক বিকল্প কারণ থাকতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন কারণ দ্বারা একই কার্য সম্পন্ন হতে পারে। যেমন- মৃত্যু একটা কার্য। কিন্তু মৃত্যুর কারণ সকল ক্ষেত্রে এক নয়। রোগের ফলে মৃত্যু হতে পারে, ফাঁসির কারণে মৃত্যু হতে পারে, বিষ প্রয়োগের কারণে মৃত্যু হতে পারে, গুলির কারণে মৃত্যু হতে পারে, সাপের কামড়েকারণে মৃত্যু হতে পারে, আবার দুর্ঘটনার কারণেও মৃত্যু হতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই কার্যের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। রেখাচিত্রের সাহায্যে উদাহরণটিকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়

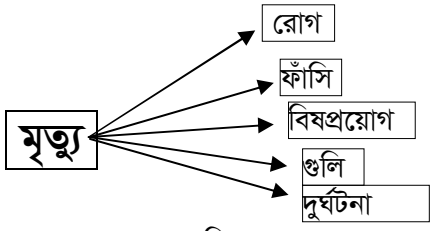

চিত্র: বহুকারণবাদ

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বহুকারণবাদে কারণকে সব সময় একটি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। একটি কারণ যে কতগুলো শর্তের সমষ্টি হতে পারে-এখানে তা বিবেচনা করা হয় না। আবার, বহুকারণবাদকে বহুকারণ সমন্বয়বাদের সাথে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। বহুকারণ সমন্বয় অনুসারে, একাধিক কারণ একসাথে মিলিত হয়ে একটি মিশ্র কার্য উৎপন্ন করে। অন্যদিকে বহুকারণবাদ অনুসারে একাধিক কারণ আলাদা আলাদাভাবে একই কার্য উৎপন্ন করে।

বহুকারণবাদ খন্ডনের উপায় (Techniques to Refute Plurality of Causes) ঃ বহুকারণবাদ মেনে নিলে কার্য ও কারণের যুক্তিসম্মত অনুমান অসম্ভব হয়ে পড়ে। কার্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উপরই মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত। নিম্নোক্ত যুক্তির সাহায্যে বহুকারণবাদের অসারতা প্রমাণ করা যায়।

১.কার্যের মতো কারণকে সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করলে বহুকারণবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। বহুকারণবাদের সমর্থকগণ কার্যকে সামগ্রিকভাবে এবং কারণকে পৃথকভাবে গ্রহণ করে একই কার্যের বহু কারণের কথা বলেন। কিন্তু কার্যের মতো কারণকেও সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলে দেখা যায় একটি মাত্র ঘটনার একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে। কার্য যেমন কতগুলো অনুগামী ঘটনার সমষ্টি, তেমনি কারণ হলো কতগুলো পূর্বগামী শর্তের সমষ্টি। এগুলোকে সামান্যীকরণ করলে দেখা যায় কারণের সংখ্যা বহু নয় একটি। যেমন- মৃত্যুকে একটি ঘটনা বলে বিবেচনা করলে এর একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে এবং যেটি হলো হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে কার্য ও কারণের সাধারণ রূপটি দেখানো হলো :

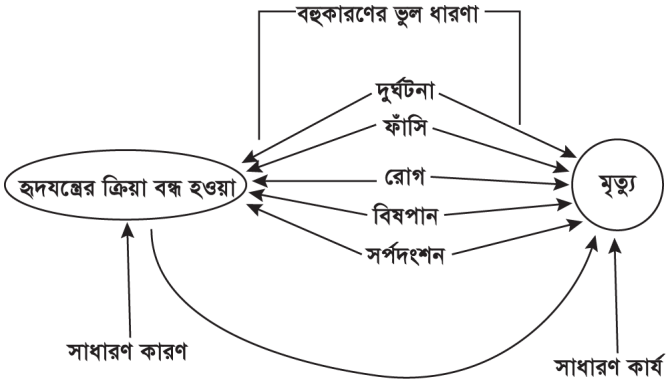

চিত্র : কার্য ও কারণের সাধারণ রূপ

বহুকারণ সমন্বয় (Conjunction of Causes) ঃ কারণের সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি যে, কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী, অপরিবর্তনীয় ও শর্তনিরপেক্ষ ঘটনা হলো কারণ। একটি কাজের পিছনে একটি মাত্র কারণই ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় সকল ঘটনা অতি সরলভাবে ঘটে না। কোনো কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা কেবল একটি কারণের ক্রিয়াশীলতার জন্য সংঘটিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল থাকার ফলে একটি মিশ্র কার্যের সৃষ্টি হয় । অর্থাৎ কয়েকটি কারণ পৃথকভাবে কাজ না করে একসাথে কাজ করে একটি মিশ্র কার্য উৎপন্ন করে। সেক্ষেত্রে কারণগুলোর সমাবেশ বা সমন্বিত রূপকে বহুকারণ সমন্বয় বলে। যেমন, W কার্যটি A, B কিংবা C কারণের দ্বারা এককভাবে ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু A, B ও C তিনটি কারণকে একত্রিত করলে কার্যটি ঘটে। তাহলে A, Bও C কারণের একত্রিত হওয়া হচ্ছে বহুকারণ সমন্বয়। যেমন- নির্দিষ্ট অনুপাতের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণের ফলে পানি উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে পানি একটি মিশ্র কার্য এবং পানি উৎপাদনের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয় ঘটেছে। এর অর্থ হলো এখানে বহুকারণ সমন্বয় ঘটেছে।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, বহুকারণবাদ ও বহুকারণ সমন্বয় এক নয়। বহুকারণবাদ অনুসারে কয়েকটা কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে একই কার্য সংঘটন করে। কিন্তু বহুকারণ সমন্বয়বাদ অনুসারে, কয়েকটি কারণ একত্রিত হয়ে একটি মিশ্র ফল সৃষ্টি করে।

কার্য সংমিশ্রণ (Intermixture of Effects) ঃ যখন একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল হয়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্য উৎপাদন না করে কোনো একক কার্য উৎপন্ন করে তখন কারণসমূহ দ্বারা সৃষ্ট কার্যকে মিশ্র কার্য বলে। এরূপ ক্ষেত্রে কার্যসমূহের মিশ্র প্রকাশকেই কার্য সংমিশ্রণ বলে। এর অর্থ হলো কার্য সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে বহুকারণ দ্বারা সৃষ্ট কার্যসমূহ মিশ্রিত রূপে প্রকাশিত হয়। যেমন-একটা কক্ষে দিনের আলো যতটুকু পড়ে ততটুকু পর্যাপ্ত নয়। তাই একটি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে আলো বৃদ্ধি করা হলো। ফলে এ কক্ষে কার্য সংমিশ্রন ঘটলো। কার্য সংমিশ্রণ দুই ধরনের হতে পারে; যথা-

ক. সমজাতীয় কার্য সংমিশ্রণ (Homogeneous Intermixture of Effects)
খ. ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণ (Heteropathic Intermixture of Effects)

সমজাতীয় কার্য সংমিশ্রণ : যদি একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল থাকে এবং কারণগুলো দ্বারা সৃষ্ট কার্য একই প্রকৃতির হয় তাহলে এই একই জাতীয় কার্যগুলোর সমন্বিত অবস্থাকে সমজাতীয় কার্য সংমিশ্রণ বলে। যেমন-একটি রুমের অন্ধকার দূর করার জন্য ৬০ ওয়াট শক্তি সম্পন্ন তিনটি বাল্ব জ্বালানো হলো। এখানে প্রত্যেকটি বাতি থেকে সৃষ্ট আলো এবং বাতিগুলো থেকে সৃষ্ট আলোর মিশ্রিত রূপ একই জাতীয়। তাই এক্ষেত্রে সমজাতীয় কার্য সংমিশ্রণ ঘটেছে।

ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণ : যদি একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল থাকর ফলে সৃষ্ট মিশ্র কার্য, ক্রিয়াশীল কারণসমূহ থেকে সৃষ্ট পৃথক পৃথক কার্যের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন হয়, তাকে ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণ বলে। যেমন-আমাদের খাদ্য গ্রহণের পরবর্তী জৈবিক প্রক্রিয়া ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করি: মাংস, দুধ, ডিম, ভাত, পানি, লবন ইত্যাদি। এগুলো হজমের পর আমাদের শরীরে খাদ্য প্রাণ তৈরি হয় যা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ গঠন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বহুকারণবাদ সম্পর্কে যুক্তিবিদআলেকজান্ডার বেইন-এর বক্তব্যের একটি চিত্রভিত্তিক দৃস্টান্ত তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

বহুকারণবাদ অনুসারে একটি কার্যের পিছনে একাধিক বা বহু কারণ থাকতে পারে। অর্থাৎ একটি কার্যের একাধিক বিকল্প কারণ থাকতে পারে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ মতবাদ যথার্থ নয়। বহুকারণ সমন্বয় অনুসারে, একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল থাকার ফলে একটি মিশ্র কার্যের সৃষ্টি হয়। কার্য সংমিশ্রণ দুই প্রকার: সমজাতীয় কার্য সংমিশ্রণ ও ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বহুকারণবাদের প্রবক্তা কে?

(ক) এরিস্টটল (খ) মিল (গ) ওয়েল্টন (ঘ) বেকন

২। বহুকারণবাদ খন্ডনের জন্য-

(i) কারণকে একটিমাত্র ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে (ii) কার্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে হবে

(iii) কারণের মূল বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

৩। পান, সুপারি, চুন, খয়ের ইত্যাদি ভালোভাবে মিশিয়ে লাল রং তৈরি করা হলো-

(ক) ঘটনা সংযোজন (খ) বহুকারণ সমন্বয় (গ) কার্য-সংমিশ্রণ (ঘ) যুক্তিসাম্যতা

পাঠ-১০.৭ আরোহের বস্তুগত ভিত্তিঃ নিরীক্ষণ (Material Ground of Induction: Observation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরীক্ষণের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- নিরীক্ষণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষণের শর্তগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষণের অনুপপত্তিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নিরীক্ষণের সংজ্ঞা (Definition of Observation) ঃ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো প্রাকৃতিক বিষয় ও ঘটনাবলি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত ও নির্বাচনমূলক প্রত্যক্ষণকে নিরীক্ষণ বলে। সাধারণভাবে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তু জগতের বিষয় ও ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত হই। ইন্দ্রিয়ের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়া হলো প্রত্যক্ষণ। নিরীক্ষণ হলো এক ধরনের প্রত্যক্ষণ। কিন্তু সকল প্রত্যক্ষণ নিরীক্ষণ নয়। আমরা যা উদ্দেশ্যহীনভাবে অসতর্ক অবস্থায় দেখি বা শুনি তা প্রত্যক্ষণ, নিরীক্ষণ নয়। আকাশে উড়ন্ত পাখির ডানা, মাঠে শস্যক্ষেত্রে কাজ করা চাষী, রাস্তায় চলমান গাড়ি ইত্যাদি হলো প্রত্যক্ষণ। কিন্তু এসব প্রত্যক্ষণ উদ্দেশ্যহীন, অসতর্ক ও অনিয়ন্ত্রিত। এসবের প্রতি আমরদের সক্রিয় মনোযোগ থাকে না। তাই এগুলো আমাদের মনে কোনো রেখাপাত করে না। সুতরাং আমরা যখন কোন বস্তু বা ঘটনা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে ধীরস্থির ভাবে প্রত্যক্ষণ করি তখন তা হয় নিরীক্ষণ। যেমন-

(১) ফুল বাগানের বিচিত্র রঙের যে সব ফুল আমরা সচরাচর দেখি তা প্রত্যক্ষণ, নিরীক্ষণ নয়। কিন্তু মৌমাছি, কীট-পতঙ্গের সাহায্য ছাড়া ফুলের নিজস্ব কোন পরাগায়ন ব্যবস্থা আছে কি না খতিয়ে দেখা হলে তা হবে নিরীক্ষণ।

(২) রাস্তায় চলার সময় আমরা স্কুল মাঠে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের দলে দলে বিভক্ত হয়ে খেলতে দেখি। এ দেখা প্রত্যক্ষণ, নিরীক্ষণ নয়। কিন্তু তাদের কোন্ নীতিতে দলে ভাগ করা হয়েছে, বয়সের ভিত্তিতে না উচ্চতার ভিত্তিতে তা পরীক্ষা করে দেখা হলে তা হবেনিরীক্ষণ।

নিরীক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Observation) ঃ নিরীক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য গুলো পাই।

১. নিরীক্ষণ হলো বিশেষ এক প্রকারের প্রত্যক্ষণ। নিরীক্ষণ হলো এমন এক ধরনের প্রত্যক্ষণ যার মধ্যে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য, একনিষ্ঠ মনোযোগ, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন।

২. নিরীক্ষণ হলো প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রত্যক্ষণ। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা কেবল সেসব ঘটনা সেভাবেই প্রত্যক্ষণ করি যেসব ঘটনা প্রকৃতিতে ঘটে এবং যেভাবে ঘটে। প্রত্যক্ষণের সুবিধার জন্য আমরা ঘটনাকে ইচ্ছা মতো ঘটাতে বা পরিবর্তন করতে পারি না। আমরা যে ঘটনা নিরীক্ষণ করতে চাই তা ঘটার জন্য আমাদেরকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন- চন্দ্রগ্রহণ নিরীক্ষণ করা।

৩. নিরীক্ষণ হলো একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষণ।অনেক বস্তু বা ঘটনা প্রতিনিয়ত আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোতে ধরা পড়ে এবং আমাদের মনোযোগের অভাবে হারিয়ে যায়। কারণ এগুলো প্রত্যক্ষণ করার জন্য আমাদের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষণ করি।

৪. নিরীক্ষণ হলো নির্বাচনমূলক প্রত্যক্ষণ। যেহেতু নিরীক্ষণ একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষণ সেহেতু আমরা উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত প্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেই এবং অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে পরিহার করি বা নিরীক্ষণের বাইরে রাখি।

৫. নিরীক্ষণ হলো পরিকল্পিত প্রত্যক্ষণ। প্রাকৃতিক ঘটনাবলি যেমন অগোছালো অবস্থায় থাকে, তেমনি বহু ঘটনার সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এসব ঘটনার যেগুলো আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত কেবল সেগুলোই নিরীক্ষণ করতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একাধিক ঘটনা নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন। সেজন্য অনুসন্ধানকারীকে কখন, কিভাবে, কোন অবস্থান থেকে নিরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করতে হবে সে বিষয়ে সর্তক থাকতে হবে। অর্থাৎ নিরীক্ষণ হলো এক ধরনের পরিকল্পিত প্রত্যক্ষণ।

৬. নিরীক্ষণ হলো সুনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণ। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নিরীক্ষণ করা হয় বলে নিরীক্ষণ সব সময়ই সুনিয়ন্ত্রিত। যে প্রত্যক্ষণ বিশৃঙ্খল ও অনিয়ন্ত্রিত তাকে নিরীক্ষণ বলা যায় না। আবার, যে প্রত্যক্ষণ উদ্দেশ্য অভিমুখে পরিচালিত এবং গভীর মনোযোগের সাথে ধীরস্থিরভাবে সম্পাদিত তাকেই বলে নিরীক্ষণ । সুতরাং কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণকেই বলা হয় নিরীক্ষণ ।

৭. নিরীক্ষণ হলো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষণ। সংবেদন যখন প্রাকৃতিক পরিবেশে সুনিয়ন্ত্রিত ও নির্বাচিতভাবে সম্পন্ন হয়, তখন তা প্রত্যক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। আর যখন তা পরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘটে তখন তাকে বলে নিরীক্ষণ। একথার অর্থ হলো কোনো প্রত্যক্ষণকে নিরীক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করতে হলে তা পরিচালিত হতে হবে যথার্থ প্রক্রিয়ায়।

৮. নিরীক্ষণ হলো প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ। নিরীক্ষণ বলতে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রত্যক্ষণ বোঝায়, তেমনি প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ নির্দেশ করে। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা নিরীক্ষণ বলে বিবেচিত হতে পারেনা।

নিরীক্ষণের শর্ত (ConditionsofObservation) ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক ঘটনার পদ্ধতিগত ও নিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণই হলো নিরীক্ষণ । তবে নির্ভুল নিরীক্ষণের জন্য অনুসন্ধানকারীর যথেষ্ট শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন। ভালভাবে নিরীক্ষণ করার জন্য কতগুলো সাধারণ শর্তের উপস্থিতি আবশ্যক। যুক্তিবিদ জয়েস (Joyce) এুটিহীন নিরীক্ষণের জন্য তিনটি শর্তের কথা বলেছেন। যথা-

১. বৌদ্ধিক শর্ত (Intellectual Condition)
২. শারীরিক শর্ত (Physical Condition)
৩. নৈতিক শর্ত (Moral Condition)

বৌদ্ধিক শর্ত : বৌদ্ধিক শর্ত বলতে অনুসন্ধানকারীর মানসিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। সঠিক ও যথাযথ নিরীক্ষণের জন্য আগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগ্রহের অভাব নিরীক্ষণকে এুটিপূর্ণ করতে পারে। জানার আগ্রহ ব্যক্তিকে ধৈর্য ও সতর্কতার সাথে আলোচ্য বিষয়কে জানতে সাহায্য করে। কার্যকর ও যথার্থ নিরীক্ষণ নির্ভর করে অনুসন্ধানকারীর মানসিক দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর। কারণ, নিরীক্ষণের জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা, উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিষয় বস্তুকে নির্বাচন করা এবং সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং যথার্থ নিরীক্ষণের জন্য বৌদ্ধিক শর্তের উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শারীরিক শর্ত : এুটিহীন নিরীক্ষণের জন্য শারীরিক সুস্থতা একান্ত প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা বা স্বাভাবিক কার্যক্ষমতার উপর যথার্থ নিরীক্ষণ নির্ভরশীল। একজন বর্ণান্ধ ব্যক্তি যেমন রঙের বৈচিত্র নিরীক্ষণ করতে পারেন না, তেমনি একজন বধির ব্যক্তি সুরের বৈচিত্র নিরীক্ষণে সক্ষম নয় । তাই যথার্থ নিরীক্ষণের জন্য দৈহিক শর্তের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

নৈতিক শর্তঃ সঠিক নিরীক্ষণের জন্য সংস্কার মুক্ত নিরপেক্ষ মন একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ব্যক্তির পূর্ব ধারণা, সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই তার প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করতে পারে। কাজেই নিরীক্ষণকে এুটিহীন করার জন্য অনুসন্ধানকারীকে পক্ষপাতশূন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে হবে। যথার্থ নিরীক্ষণের জন্য নৈতিক শর্ত মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিরীক্ষণের অনুপপত্তি (Fallacies of Observations) ঃ নিরীক্ষণ হলো প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক ঘটনার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগত প্রত্যক্ষণ। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক সেগুলো হলো নিরীক্ষণের আগ্রহ, দৈহিক সুস্থতা ও বিষয়ের প্রতি মানসিক সংস্কার-মুক্ততা। কোনো ক্ষেত্রে এর যে কোনো একটি শর্তের অভাব হলে নিরীক্ষণ যথার্থ হয় না; অনুপপত্তি ঘটে। নিরীক্ষণ মূলত দুই ভাবে অযথার্থ হতে পারে। নিরীক্ষণের বিষয়কে সামগ্রিকভাবে নিরীক্ষণের পরিবর্তে আংশিক নিরীক্ষণ করা হলে এবং নিরীক্ষণের বিষয়কে ভুলভাবে বা অন্য কিছু হিসেবে নিরীক্ষণ করা হলে। ফলে অযথার্থ নিরীক্ষণের পরিণতিতে দুই ধরনের অনুপপত্তি ঘটতে পারে। যেমন-

১. অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি
২. ভ্রান্ত নিরীক্ষণ অনুপপত্তি

নিম্নে ছকের সাহায্যে অযথার্থ নিরীক্ষণের অনুপপত্তিসমূহ তুলে ধরা হলো :

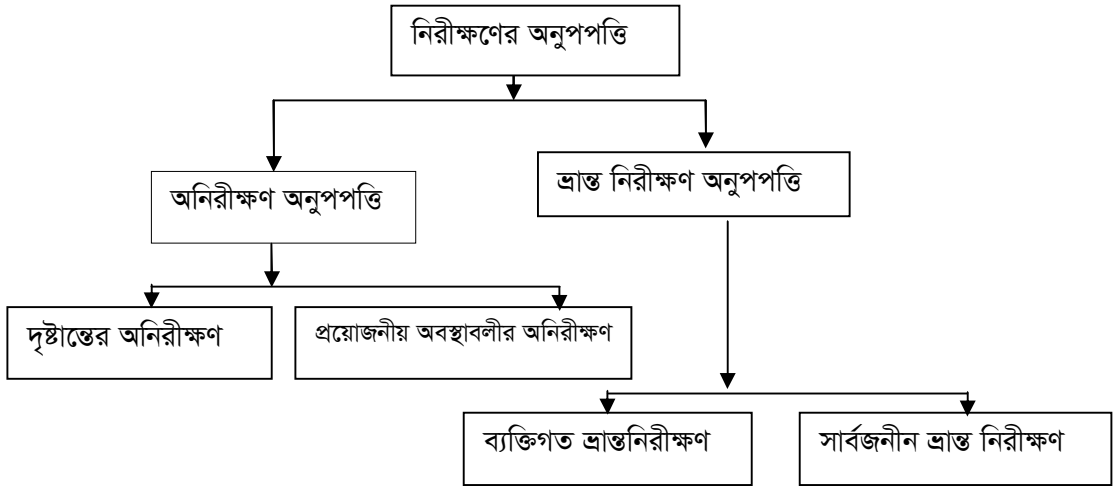

ক. অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি : নিরীক্ষণ একটি নির্বাচনমূলক প্রক্রিয়া। নির্বাচণের সময় কোনো কারণে কোনো দৃষ্টান্ত বা কোনো প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষিত থেকে যেতে পারে। যদি সকল বস্তু বা ঘটনা নিরীক্ষণ না করে আংশিক নিরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলে অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটে। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অনিরীক্ষণই এরূপ অনুপপত্তি ঘটার কারণ। তাহলে অনিরীক্ষণ অনুপপত্তির সংজ্ঞায় আমরা বলতে পারি যে, আরোহ অনুমানে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সকল প্রাসঙ্গিক বস্তু বা ঘটনা নিরীক্ষণ না করে আংশিক নিরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি বলে।

অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি দুই ধরনের হতে পারে; যথা-

১. দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি
২. প্রয়োজনীয় অবস্থার অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি

দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি : নিরীক্ষণ করার ক্ষেত্রে আমরা উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তের সকল ঘটনা নিরীক্ষণ করি এবং অপ্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তকে বর্জন করি। কিন্তু অসাবধানতা বা তাড়াহুড়ার কারণে অনেক সময় আমরা কিছু প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, বিশেষভাবে কোনো প্রতিকূল দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ না করে সিদ্ধান্ত গহণ করা হয়। এর ফলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে বলা হয় দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি। কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের কারণেও এরূপ অনুপপত্তির উদ্ভব হয়। নিরীক্ষণের পূর্ব থেকেই আমাদের যদি কোনো সংস্কার বা বিশ্বাস থাকে তাহলে তার দ্বারা নিরীক্ষণ প্রভাবিত হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের সংস্কার বা বিশ্বাসের অনুকূল দৃষ্টান্তগুলো আগ্রহ সহকারে নিরীক্ষণ করি, কিন্তু প্রতিকূল দৃষ্টান্তগুলোর প্রতি উদাসীন থাকি। ফলে অনুপপত্তি ঘটে। যেমন-কতিপয় ক্ষেত্রে শেষ রাতের দেখা স্বপ্ন সত্য হয়েছে, এরূপ লক্ষ্য করে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়ে যে, 'শেষ রাতের স্বপ্ন সত্যি হয়' তাহলে দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি ঘটে। কারণ, যেসব দৃষ্টান্তে শেষ রাতে দেখা স্বপ্ন সত্যি হয়নি, সেগুলো নিরীক্ষণ না করে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় অবস্থার অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি : কোনো ঘটনার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুলক্রমে বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বাদ দিয়ে অপয়োজনীয় অবস্থার নিরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে বাস্তবে যেসব অবস্থা ঘটনাটি ঘটায় তাদের নিরীক্ষণ না করে কতগুলো আকস্মিক ও অবাস্তব অবস্থাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বসি। ফলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে বলে প্রয়োজনীয় অবস্থাবলির অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি। অপরাধের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দেখে যদি আমরা বলি যে, অপরাধীর সংখ্যা বেড়েছে তবে প্রয়োজনীয় অবস্থার অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি ঘটে। কারণ শাস্তিপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বেড়েছে পুলিশের অধিকতর তৎপরতার জন্য বা বিচার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য, অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নয়।

খ. ভ্রান্ত নিরীক্ষণ অনুপপত্তি : কোনো বিষয় বা বস্তুকে তার যথার্থ প্রকৃতির ভিত্তিতে নিরীক্ষণ না করে ভিন্ন কোনো বিষয় বা বস্তু হিসেবে নিরীক্ষণ করা হলে ভ্রান্ত নিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটে। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোনো বস্তু বা ঘটনাকে প্রত্যক্ষণ করি। নিরীক্ষণের মধ্যে ভ্রান্তির উৎপত্তি হয় প্রত্যক্ষিত বস্তু বা ঘটনার ভুল ব্যাখ্যার কারণে। আমরা আসলে যা দেখি তাকে ভিন্ন কিছু বলে ধারণা করি। তবে ভ্রান্ত নিরীক্ষণের সংজ্ঞায় আমর বলতে পারি যে, যদি কোনো বস্তু বা ঘটনা বাস্তবে যেভাবে ঘটে বা থাকে তাকে সেভাবে না দেখে আমরা ভুলক্রমে ভিন্নভাবে দেখি তবে তাকে ভ্রান্ত নিরীক্ষণ বলে। যেমন, সন্ধ্যার কম আলোতে আমরা রশিকে সাপ বলে ভুল করি, অন্ধকারে ঝোপঝাড়কে বা বৈদ্যুতিক খুঁটিকে আমরা ভুত বলে ভুল করি। ভ্রান্ত নিরীক্ষণ দুই প্রকার; যথা-

১. ব্যক্তিগত ভ্রান্ত নিরীক্ষণ
২. সার্বজণীন ভ্রান্ত নিরীক্ষণ

ব্যক্তিগত ভ্রান্ত নিরীক্ষণ : যে ভ্রান্ত নিরীক্ষণ কোনো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ঘটে, অর্থাৎ যেক্ষেত্রে কোনো বিষয় বা বস্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে ভিন্ন কিছু হিসেবে নিরীক্ষিত হয়, তাকে ব্যক্তিগত ভ্রান্ত নিরীক্ষণ বলে। যেমন-অন্ধকারে রাতে অল্প আলোতে পড়ে থাকা রশি কোনো ব্যক্তির কাছে সাপ বলে নিরীক্ষিত হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভ্রান্ত নিরীক্ষণ ঘটে।

সার্বজণীন ভ্রান্ত নিরীক্ষণ : যে ভ্রান্ত নিরীক্ষণ কোনো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে সামগ্রিকভাবে অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে বা প্রায় সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে তাকে সার্বজণীন ভ্রান্ত নিরীক্ষণ বলে। অর্থাৎ অনেক ব্যক্তি যখন নিরীক্ষণের বিষয়কে ভিন্ন কিছু হিসেবে নিরীক্ষণ করে তখন সার্বজণীন ভ্রান্ত নিরীক্ষণের উদ্ভব ঘটে। যেমন- সূর্যকে পূর্ব দিকে উঠতে দেখা এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে দেখা একটি সার্বজনীন ভ্রান্ত নিরীক্ষণ। মূলত: সূর্য স্থির, পৃথিবী এর চারপাশে ঘোরে। আবার, আমরা চলন্ত ট্রেন বা বাসের জানালা দিয়ে দূরের গাছপালাকে বিপরীত দিকে ছুটতে দেখি। এটা একটি সার্বজনীন ভ্রান্ত নিরীক্ষণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিরীক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা যায় তা লিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ- এ দু'টি হলো আরোহের বস্তুগত ভিত্তি। বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো ঘটনার নিয়ন্ত্রিত ও নির্বাচনমূলক প্রত্যক্ষণ হলো নিরীক্ষণ। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। নিরীক্ষণের তিনটি শর্ত: বৌদ্ধিক, শারীরিক ও নৈতিক শর্ত। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি হলে দুই ধরনের অনুপপত্তি ঘটে; যথা: অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ও ভ্রান্ত নিরীক্ষণ অনুপপত্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিরীক্ষণ কোথায় করতে হয়

(ক) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে (খ) প্রাকৃতিক পরিবেশে (গ) পরীক্ষাগারে (ঘ) কৃত্রিম পরিবেশে

২। নিরীক্ষণ হলো-

(i) উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষণ (ii) নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ (iii) অতি সতর্কতার সাথে প্রত্যক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

৩ নিরীক্ষণের শর্ত কয়টি?

(ক) ৬টি (খ) ৫টি (গ) ৪টি (ঘ) ৩টি

পাঠ-১০.৮ আরোহের বস্তুগত ভিত্তি : পরীক্ষণ (Material Ground of Induction: Experiment)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরীক্ষণের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- পরীক্ষণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।

পরীক্ষণের সংজ্ঞা (Definition of Experiment) ঃ পরীক্ষণে আমরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ঘটনাবলি সৃষ্টি করি। পরীক্ষণের অবস্থাবলির উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। ঘটনা সৃষ্টির জন্য আমরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থাকি না। আমাদের প্রস্তুতকৃত পরিবেশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমরা কৃত্রিমভাবে পরীক্ষণীয় ঘটনা তৈরি করি এবং ধীরস্থিরভাবে তাকে নিরীক্ষণ করি। পরীক্ষণ এক ধরনের নিরীক্ষণ; তবে তা কৃত্রিম পরিবেশে কৃত্রিম ঘটনার ক্ষেত্রে। যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (Carveth Read) বলেন, পরীক্ষণ হচ্ছে পূর্ব পরিকল্পিত ও জ্ঞাত অবস্থাবলির ভিত্তিতে নিরীক্ষণ। তাহলে পরীক্ষণের সংজ্ঞায় আমরা বলতে পারি যে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সহকারে নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থাবলির ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট কোনো বস্তু বা ঘটনাকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রত্যক্ষণ করাকে পরীক্ষণ বলে।

উদাহরণস্বরূপ,একজন রসায়নবিদ তাঁর গবেষণাগারে দুইভাগ হাইড্রোজেনের সাথে এক ভাগ অক্সিজেন মিশিয়ে তাতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে পানি উৎপন্ন করেন। পানি তৈরির এ প্রক্রিয়াটি একটি পরীক্ষণ।

পরীক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Experiments) ঃ পরীক্ষণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। পরীক্ষণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১। পরীক্ষণ উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষণ। পরীক্ষণে পরীক্ষক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন,কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং তারপর পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করেন। উদ্দেশ্যবিহীন কোনো পরীক্ষণ সম্ভব নয়।

২। পরীক্ষণ কৃত্রিম ঘটনার প্রত্যক্ষণ। যেসব ঘটনা পরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণ করা হয় তা কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত ঘটনা। পরীক্ষণকারী নিজ সৃষ্ট পরিবেশে কৃত্রিমভবে ঘটনা তৈরি করেন, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেন এবং নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করেন। কাজেই পরীক্ষণ হলো সুনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণ।

৩। পরীক্ষণ হলো কৃত্রিম পরিবেশে প্রত্যক্ষণ। পরীক্ষণ কৃত্রিম বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উৎপাদিত ঘটনার ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে পরীক্ষক পরীক্ষণের জন্য নিজেই তার পরিবেশ প্রস্তুত করেন।

৪। পরীক্ষণ হলো এক ধরনের স্বনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণ। পরীক্ষণের পরিবেশ ও অবস্থাবলি সম্পূর্ণ পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আবার, পরীক্ষক নিজেই তার উৎপাদিত ঘটনা প্রত্যক্ষণ করেন। অর্থাৎ ঘটনার পরিবেশ ও উৎপাদন পুরোটাই পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৫। পরীক্ষণ হলো এক ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক প্রত্যক্ষণ। পরীক্ষণে পরীক্ষণীয় বিষয়ের উপর পরীক্ষকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। তাই তিনি যতবার খুশি ততবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। পরীক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষক তাঁর ইচ্ছামত ঘটনার পুনরুৎপাদন করতে পারেন।

৬। পরীক্ষণ এক ধরনের বিশ্লেষণমূলক প্রত্যক্ষণ। প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা জটিল অবস্থায় থাকে। একটি বস্তু বা ঘটনা অন্যান্য বস্তু বা ঘটনার সাথে জড়িয়ে থাকে। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ সম্ভব না হলেও পরীক্ষণের ক্ষেত্রে তা সম্ভব। কারণ পরীক্ষণে ঘটনাগুলো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে। তাই অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়কে আলাদা করে তার উপর ইচ্ছা মতো পরীক্ষণ চালানো সহজ হয়।

৭। পরীক্ষণ ধীর-স্থিরস্থিরভাবে প্রত্যক্ষণ। পরীক্ষণ হলো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ঘটনা প্রত্যক্ষণ। এ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় সম্পূর্ণ পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। ফলে এক্ষেত্রে কোনো অস্থিরতা থাকে না। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কখন ঘটনা ঘটবে বা কখন হঠাৎ করে ঘটনা শেষ হয়ে যাবে সেজন্য, প্রতীক্ষা বা তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন হয় না।

৮। পরীক্ষণের ফলাফল সুনিশ্চিত হয়। পরীক্ষণে পরীক্ষণীয় ঘটনা ও পরিবেশের উপর পরীক্ষকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। কাজেই পরীক্ষক ঘটনাকে পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে বারবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এরূপ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পরীক্ষক তার পরীক্ষণের ফলাফল বিভিন্নভাবে যাচাই করতে পারেন এবং ফলাফলের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট পরিবেশে কোনো নিয়ন্ত্রিত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হলো পরীক্ষণ। এটা হলো এক ধরনের বিশ্লেষণমূলক প্রত্যক্ষণ এবং এর ফলাফল সুনিশ্চিত হয়। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটনা বারবার ঘটানো যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরীক্ষণে কীসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়?
(ক) ঐতিহাসিক সত্যতা (খ) দৃষ্টান্তের সংখ্যা (গ) বিষয়বস্তু (ঘ) উদ্দেশ্য

২। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক নয়?
(ক) পরীক্ষণ ধীর-স্থিরভাবে প্রত্যক্ষণ (খ) পরীক্ষণের ফলাফল সুনিশ্চিত নয়
(গ) পরীক্ষণ হলো কৃত্রিম পরিবেশে প্রত্যক্ষণ (ঘ) পরীক্ষণ উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষণ

৩। "পরীক্ষণ হচ্ছে পূর্ব পরিকল্পিত ও জ্ঞাত অবস্থাবলির ভিত্তিতে নিরীক্ষণ।"- উক্তিটি করেছেন কোন্‌ যুক্তিবিদ?
(ক) এরিস্টটল (খ) মিল (গ) বেইন (ঘ) কার্ভেথ রিড

পাঠ-১০.৯ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধাসমুহ (Advantages and Disadvantages of Observation and Experiment)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের সুবিধাগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের অসুবিধাগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষণের তুলানায় পরীক্ষণের সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের অসুবিধাগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের সুবিধা (Advantages of Observation over Experiment)ঃ

১। নিরীক্ষণের ক্ষেত্র পরীক্ষণের তুলনায় ব্যাপক। নিরীক্ষণে আমরা এমন সব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে পারি যার পরীক্ষণ সম্ভব নয় বা পরীক্ষণ বিপদজনক। প্রকৃতিতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যদের আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। যেমন- ভূমিকম্প, চন্দ্রগ্রহণ, সামুদ্রিক ঝড় ইত্যাদি। এসব ঘটনা কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে কোনোভাবেই ঘটানো সম্ভব নয়। আবার মানব শরীরে বিষের প্রভাব কি বা যুদ্ধের ফলে দু'টি দেশের পরিবেশগত প্রভাব কি ঘটে তা আমরা পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ করতে পারি না। এসব ক্ষেত্রে নিরীক্ষণের উপরই আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয় । সতরাং নিরীক্ষণের ক্ষেত্র পরীক্ষণ থেকে বৃহত্তর।

২। নিরীক্ষণের জন্য কোনো বিশেষ পরিবেশ প্রস্তুতের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পরীক্ষণের জন্য পরিবেশ নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। যেহেতু নিরীক্ষণ প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্পন্ন হয়, তাই নিরীক্ষণের জন্য পরিবেশ নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে পরীক্ষণ সম্ভব নয়, এজন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের প্রয়োজন হয়। ফসল উৎপাদনে অতিবৃষ্টির প্রভাব প্রত্যক্ষণের জন্য বিশেষ কোনো পরিবেশের প্রয়োজন হয় না কিন্তু তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে কোনো একটা গ্যাসের আয়তনে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে তা নির্ণয় করার জন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পরীক্ষণে আমরা শুধু কারণ থেকে কার্যে যেতে পারি, কার্য থেকে কারণে যেতে পারি না। আরোহ অনুমানে কখনো জানা কার্যের কারণ বা জানা কারণের কার্য নির্ণয় করতে হয়। নিরীক্ষণে যেহেতু আমরা ঘটনা উৎপাদন করি না, আবিষ্কার করি সেহেতু এক্ষেত্রে আমরা জানা কার্যের কারণএবং জানা কারণের কার্য বের করতে পারি। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির জ্বরের কারণ আমরা যেমন জানতে পারি, তেমনি ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি আমরা পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারি। কিন্তু পরীক্ষণ হলো কৃত্রিম পরিবেশে কৃত্রিম ভাবে উৎপাদিত ঘটনা প্রত্যক্ষণ। তাই এক্ষেত্রে আমরা কারণের পর্যাপ্ত উপস্থিতির ভিত্তিতে কার্য উৎপাদন করতে পারি। কিন্তু কার্য সংঘটনের পর এর কারণ উৎপাদন করতে পারি না।

৪। নিরীক্ষণের স্থান পরীক্ষণের পূর্বে, আর পরীক্ষণের স্থান নিরীক্ষণের পরে। নিরীক্ষণ প্রাকৃতিক পরিবেশে ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়। তাই ঘটনা নিরীক্ষণের জন্য পরীক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পরীক্ষণের সাহায্যে কোনো দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে হলে পরিবেশ পরিবর্তন ও দৃষ্টান্ত উৎপাদনের পয়োজন হয়। ফলে সে ঘটনার সংশ্লিষ্ট অবস্থাবলি ও যন্ত্রপাপতি সম্পর্কে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক। পরীক্ষণ শুরু করার আগে পরীক্ষণীয় বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের কিছুটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরীক্ষণের পূর্বেই নিরীক্ষণ করতে হয় বলে নিরীক্ষণের স্থান পরীক্ষণের পূর্বে।

৫। নিরীক্ষণ পরীক্ষণের চেয়ে সহজ ও সরল প্রক্রিয়া। পরীক্ষণ একটি জটিল, কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এতে যথেষ্ট সময়, শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু নিরীক্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল প্রক্রিয়া। কোনো যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রকৃতির বহু ঘটনা নিরীক্ষণ করতে পারি।

পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের অসুবিধা (Disadvantages of Observation over Experiment) ঃ

১। নিরীক্ষণে প্রয়োজনবোধে একই ঘটনাকে বারবার দেখা যায় না। নিরীক্ষণে নির্বাচিত ঘটনা ঘটার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। তাই অনুসন্ধানকারী ঘটনাটি আবার ঘটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটার জন্য প্রকৃতির খেয়াল-খুশির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

২। নিরীক্ষণে আলোচ্য বস্তু বা ঘটনাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে আলাদা করা যায় না। প্রকৃতিতে ঘটনাবলি অত্যন্ত জটিল অবস্থায় থাকে। নিরীক্ষণে নিরীক্ষণীয় ঘটনাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না । কিন্তু একটা ঘটনা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য তাকে অন্যান্য ঘটনা বা অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া প্রয়োজন। নিরীক্ষণে তা সম্ভব হয় না।

৩। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। নিরীক্ষণ প্রকৃতি নির্ভর বলে প্রয়োজন অনুসারে পারিপার্শিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায় না। কারণ নিরীক্ষণের ঘটনাগুলো অনুসন্ধানকারী ইচ্ছা মতো প্রস্তুত করতে পারেন না। ঘটনাটি প্রকৃতিতে যেভাবে ঘটে সেভাবেই প্রত্যক্ষণ করতে হয়।

৪। নিরীক্ষণে ধীরস্থিরভাবে আলোচ্য ঘটনাকে প্রত্যক্ষণ করা যায় না। নিরীক্ষণে প্রাকৃতিক ঘটনাবলির উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা খুব দ্রুত ঘটে যায়। এগুলো খুব তাড়াহুড়া করেই নিরীক্ষণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

৫। নিরীক্ষণের সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয়ে থাকে। কিন্তু পরীক্ষণের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হতে পারে। নিরীক্ষণ হলো প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক ঘটনা প্রত্যক্ষণ। এক্ষেত্রে পরিবেশ যেমন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তেমনি কোনো ঘটনা পুনরুৎপাদন করা যায় না। ফলে যখন কোনো ঘটনা ঘটে, প্রয়োজনে কেবল তখনই নিরীক্ষণ করতে হয় । তাই অপ্রয়োজনীয় অবস্থাবলি সংশ্লিষ্ট থাকলে তা যেমন অপনয়ন করা যায় না, তেমনি একবার নিরীক্ষণের পর গৃহীত সিদ্ধান্ত যাচাইয়ের জন্য ইচ্ছা করলেই পরবর্তীতে নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয় না। বরং অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী সময়ে ঘটার জন্য। ফলে নিরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের সত্যতা সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারি না।

৬। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। নিরীক্ষণ সম্পন্ন হয় সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে। ফলে নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে যখন যে পরিবেশে ঘটনা ঘটে তখন ঠিক যে পরিবেশেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হয়। আর সে কারণেই নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো রকম সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। কিন্তু পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে।

৭। নিরীক্ষণে দৃষ্টান্তের সংখ্যা সীমিত থাকে। নিরীক্ষণ অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সম্পন্ন হয় বলে এক্ষেত্রে যখন খুশি ও যত খুশি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায় না। প্রাকৃতিক ঘটনা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। ফলে ইচ্ছা করলেই দৃষ্টান্ত উৎপাদন করা যায় না। কিন্তু পরীক্ষণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ঘটে বলে এক্ষেত্রে যখন খুশি ও যত খুশি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়।

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের সুবিধা (Advantages of Experiment over Observation) ঃ

১। পরীক্ষণের সাহায্যে অসংখ্য দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়। পরীক্ষণ হলো কৃত্রিম পরিবেশে উৎপাদিত ঘটনা প্রত্যক্ষণ। এক্ষেত্রে কেবল পরিবেশই নয়, বরং পরীক্ষণের ঘটনাও পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে পরীক্ষক যতবার খুশি দৃষ্টান্ত উৎপাদন ও প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কিন্তু নিরীক্ষণ সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ও অনিয়ন্ত্রিত ঘটনার ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয় বলে ঘটনার পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয় না।

২। পরীক্ষণে সংশ্লিষ্ট অবস্থাবলি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। পরীক্ষণে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উৎপাদিত ঘটাবলি প্রত্যক্ষণ করা হয় বলে আলোচ্য ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট অবস্থাবলি পরীক্ষকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই এ অবস্থায় পরীক্ষণের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থাবলি সহজেই বিশ্লেষণ ও নির্দেশ করা সম্ভব হয় । কিন্তু নিরীক্ষণ অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সম্পন্ন হয় বলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থাবলি বিশ্লেষণ ও নির্দেশ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

৩। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি বিচ্ছিন্ন বা অপনয়ন করা সম্ভব হয়। পরীক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সম্পন্ন হয় বলে অনুসন্ধেয় ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব থাকে তাদের বিশ্লেষণ করে প্রতিকূল ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি বিচ্ছিন্ন করা এবং যথার্থ ফল লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু নিরীক্ষণে ঘটনার উপর অনুসন্ধানকারীর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকেনা বলে প্রতিকূল ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

৪। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয়। পরীক্ষণ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সম্পন্ন হয় বলে অনুসন্ধান কার্যের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে পরীক্ষণের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়। কিন্তু পরীক্ষণ অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্পন্ন হয়ে বলে পরিবেশ পরিবর্তন সম্ভব হয় না।

৫। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটনা ধীরস্থিরভাবে সম্পন্ন করা এবং সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষণীয় বিষয়টির উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে অধিক সময় নিয়ে ধীরস্থিরভাবে ও সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। কিন্তু নিরীক্ষণে তা সম্ভব হয় না।

৬। পরীক্ষণের মাধ্যমে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত লাভ করা যায়। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটনার উপর পরীক্ষকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। ফলে পরীক্ষণীয় ঘটনাটিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করা, বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে দেখা এবং প্রয়োজনে একাধিকবার যাচাই করা যায়। তাই পরীক্ষণের ফলাফল সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটনা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। তাই নিরীক্ষণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি না।

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের অসুবিধা (Disadvantanges of Experiment over Observation) ঃ

১। পরীক্ষণের প্রয়োগ ক্ষেত্রের পরিসর নিরীক্ষণের তুলনায় অনেক কম। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক ঘটনা প্রত্যক্ষণ করা হয়। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটনাগুলোর উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। প্রাকৃতিক ঘটনার পরিসর এতই ব্যাপক যে অনেক ক্ষেত্রে ঘটনাগুলো মানুষের আয়ত্বের বাইরে থাকে। কিন্তু পরীক্ষণের সকল ঘটনাই আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। তাই পরীক্ষণের প্রয়োগ ক্ষেত্রের পরিসর অনেক কম।

২। পরীক্ষণে আমরা কেবল জ্ঞাত কারণ থেকে কার্যে যেতে পারি; কিন্তু জ্ঞাত কার্য থেকে তার কারণে যেতে পারি না। পরীক্ষণে ঘটনা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং কৃত্রিম পরিবেশে ঘটনা কৃত্রিমভাবে ঘটনো হয়। ফলে প্রথমে পূর্বগামী

ঘটনা ঘটে এবং পরে আমরা অনুগামী ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি। অর্থাৎ পরীক্ষণে কেবল কারণ থেকে কার্যে যাওয়া যায়। কিন্তু নিরীক্ষণে এ অসুবিধা নেই। নিরীক্ষণে আমরা কারণ থেকে কার্যে এবং কার্য থেকে কারণে যেতে পারি।

৩। পরীক্ষণ নিরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল। কোনো পরীক্ষণ শুরু করার পূর্বে ঘটনাটি সম্পর্কে পরীক্ষণের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ প্রাথমিক জ্ঞান আমরা পরীক্ষণের মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। কাজেই পরীক্ষণ নিরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নিরীক্ষণ পরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল নয়।

৪। পরীক্ষণ এটি জটিল প্রক্রিয়া। পরীক্ষণে যথেষ্ট শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন হয়। একটি ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে ঘটানোর জন্য যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়। এটা একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। পরীক্ষণের জন্য অনেক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু নিরীক্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল প্রক্রিয়া।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের সুবিধাগুলোলিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ উভয় ঘটনারই কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। নিরীক্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল প্রক্রিয়া এবং এর ক্ষেত্র ব্যাপক। কিন্তু নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক ঘটনার অপনয়ন করা যায় না, বারবার ঘটনা ঘটানো যায় না, ধীর স্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না এবং সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য হয়। পরীক্ষণে ঘটনা বারবার ঘটানো যায় এবং ফলাফল নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ঘটনা সহজেই অপনয়ন করা যায়। পরীক্ষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং নিরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টি পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা নয় ?

(ক) পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ঘটনা সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়।

(খ)পরীক্ষণ এটি জটিল প্রক্রিয়া

(গ) পরীক্ষণের সকল ঘটনাই নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে

(ঘ) পরীক্ষণের সাহায্যে অসংখ্য দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়

২। নিচের কোন্‌টি নিরীক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে সঠিক নয় ?

(ক) নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করা যায় না

(খ)নিরীক্ষণ এটি জটিল প্রক্রিয়া

(গ) নিরীক্ষণের সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয়ে থাকে

(ঘ) নিরীক্ষণে প্রয়োজনবোধে একই ঘটনাকে বারবার দেখা যায় না

২। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে-

(i) পারিপার্শ্বিক ঘটনার অপনয়ন করা যায় না

(ii) ধীর স্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না

(iii) সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টি প্রকৃত বা যথার্থ আরোহ নয় ?
(ক) বৈজ্ঞানিক (খ) অবৈজ্ঞানিক (গ) পূর্ণাঙ্গ (ঘ) সাদৃশ্যানুমান

২। 'আমরা এ যাবৎযত কাক দেখেছি তার সবই কালো; সুতরাং সকল কাক হয় কালো'- এ আরোহ অনুমানটি হলো-
(ক) বৈজ্ঞানিক (খ) অবৈজ্ঞানিক (গ) সাদৃশ্যানুমান (ঘ) পূর্ণাঙ্গ

৩। অপ্রকৃত বা অযথার্থ অনুমান কত প্রকার?
(ক) ৫ প্রকার (খ)৪ প্রকার (গ) ৩ প্রকার (ঘ) ২ প্রকার

৪। কারণ কোন্‌ধরনের ঘটনা?
(ক) অলৌকিক ঘটনা (খ) ভৌতিক ঘটনা (গ) বাস্তব ঘটনা (ঘ) অধি-ভৌতিক ঘটনা

৫। 'Post hoc ergo propter hoc'-এর অর্থ নিচের কোন্‌টি?
(ক) after this, therefore on account of this
(খ) for the lac of observation
(গ) for limited experience
(ঘ) not for sufficient condition

৬। 'হিমালয়ের বরফ গলাই ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে প্রবল বন্যার কারণ'- এ যুক্তিটিতে কোন্‌ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে?
(ক) সহকার্যকে কারণ হিসাবে গ্রহনজনিত (খ) অনিরীক্ষণজনিত
(গ) দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসাবে গ্রহনজনিত (ঘ) কাকতালীয়

৭। কারণ কার্যের পূর্ববর্তী-
(i) পরিবর্তনহীন ঘটনা (ii) শর্তসাপেক্ষ ঘটনা (iii) অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

৮। আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত-
(ক) নিশ্চিত (খ)অলৌকিক (গ) সম্ভাব্য (ঘ) পক্ষপাতমূলক

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৯ নং ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

পূর্ণিমার রাতে মা ও মেয়ে ট্রেনে ঢাকা যাচ্ছে। ট্রেন থেকে চাঁদের দিকে তাকিয়ে মেয়ে বলছে, "মা, চাঁদটা যেন আমাদের সাথে দৌড়াচ্ছে।" মা বলছেন, "আমি ও তাই দেখছি।" পাশের সিটের যাত্রীও বলছে, "আমি ও তাই দেখছি।"

৯। উদ্দীপকে চাঁদ দেখা কী নির্দেশ করছে?
(ক) নিরীক্ষণ (খ)পরীক্ষণ (গ) অন্তর্দর্শন (ঘ) বাস্তব প্রমাণ

১০। সকলের 'চাঁদ দৌড়ানো' দেখা-
(ক) দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণ (খ) মৌলিক অবস্থার অনিরীক্ষণ (গ) ব্যক্তিগত ভ্রান্ত নিরীক্ষণ
(ঘ) সার্বজনীন ভ্রান্ত নিরীক্ষণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

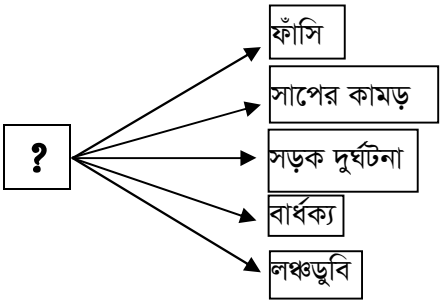

(ক) কারণের সংজ্ঞা দিন।
(খ) জগতে বস্তুর মোট পরিমাণ সকল সময় সমান থাকে কেন? বুঝিয়ে লিখুন।
(গ) চিত্রে '?' চিহ্ন কোন্ কার্য নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) চিত্রে '?' চিহ্নিত কার্যটির সাথে তীর চিহ্নিত বিষয়সমূহের সম্পর্কের স্বরূপ পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

২। বাংলাদেশের প্রথম পর্বতারোহী হিসেবে সাত মহাদেশের সাতটি সবোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ জয় করেন ওয়াসফিয়া নাজরীন। তাঁর এ জয় বাংলাদেশের বিশাল অর্জন। একটি সংবাদপত্রের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো:

সাংবাদিক: সেভেন সামিট জয়ে আপনার অভিজ্ঞতা বলুন।
ওয়াসফিয়া নাজরীন: আমি যখন ২০১২ সালে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করি, তখন আমার অভিযান ছিলো কষ্টসাধ্য এবং খুবই শ্রমসাধ্য। তবে জয় করাটা ছিলো রোমাঞ্চকর। আফ্রিকার কিলিমানজারোছিলো আরো বেশি কষ্টসাধ্য।ইউরোপের এলব্রুস ও উত্তর আমেরিকার মাউন্ট ডেনালি এবং দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাঙ্কোকাগুয়া জয় ছিলো খুবই কষ্টকর। এন্টার্কটিকার মাউন্ট ভিনসন জয় ছিলো আরো ভয়ানক কষ্টকর। অতএব, সকল পর্বতশৃঙ্গই জয় করা কষ্টকর।
সাংবাদিক: তাহলে, দেশের তরুণদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?
ওয়াসফিয়া নাজরীন: পর্বতশৃঙ্গ জয়ের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, কাজের ধাপগুলো ঠিক করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে এক একটি ধাপ শেষ করতে হবে। তাহলেই চুড়ান্ত বিজয় আসবে।
(ক) আরোহের ভিত্তি কাকে বলে?
(খ) পরীক্ষণকে আরোহের বস্তুগত ভিত্তি বলা হয় কেন?
(গ) উদ্দীপকে সাংবাদিকের প্রথম প্রশ্নের জবাবে ওয়াসফিয়া নাজরীন কোন্ অনুমান প্রক্রিয়ার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) সাংবাদিকের দ্বিতীয় প্রশ্নে ওয়াসফিয়া নাজরীনের জবাবের সাথে আরোহের যে বিষয়টির মিল রয়েছে তা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১ ঃ ১-ক, ২-ঘ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২ ঃ ১-খ, ২-ঘ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩ ঃ ১-গ, ২-ঘ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪ ঃ ১-খ, ২-ক, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫ ঃ ১-গ, ২-খ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬ ঃ ১-খ, ২-খ, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭ ঃ ১-খ, ২-খ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮ ঃ ১-গ, ২-খ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯ ঃ ১-খ, ২-খ, ৩-খ

চূড়ান্ত মূল্যায়নের উত্তরমালা

১-গ, ২-খ, ৩-গ, ৪-গ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-গ, ৯-ক, ১০-ঘ।